POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ (سورة التوبہ:6)

এবং যদি মোশরেকদের মধ্য হইতে কেহ তোমার নিকট আশ্রয় চাহে তাহা হইলে তাহাকে আশ্রয় দাও যেন আল্লাহ্‌র বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দাও। ইহা এই জন্য যে, তাহারা এমন জাতি যাহারা কিছুই অবগত নহে।

(তওবা: ৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 13

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 28 March, 2024 18 রমযান 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (سورة البقرة، آیت 186)

অনুবাদ:রমযান সেই মাস যাহাতে নাযেল করা হইয়াছে কুরআন যাহা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান(হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে, কিন্তু যে কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইলে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করিতে হইবে; আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চাহেন না, এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়াছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা বাকারা: ১৮৬)

খোদা তা'লা চাইলে অন্যান্য জাতির ন্যায় এই উম্মতে কোন বিধিনিষেধ রাখতেন না। কিন্তু তিনি এই বিধিনিষেধ উপকারার্থে রেখেছেন।

মানুষ যখন নিজেকে খোদার কারণে কষ্টে নিপতিত করে, তখন তিনি স্বয়ং পিতা-মাতার ন্যায় মমতাশীল হয়ে বলেন, তুমি কেন নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলে রেখেছ?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

একবার আমার মনে এ প্রশ্নের উদয় হলো যে, ফিদিয়া কেন নির্ধারণ করা হলো? (অভিনিবেশ করে) বুঝলাম, সামর্থ্য লাভের জন্য যেন রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ হয়। খোদা তা'লার সত্তাই সামর্থ্য দান করে থাকেন আর সবকিছু আল্লাহ তা'লার কাছেই যাচনা করা উচিত। আল্লাহ্‌ তা'লা হলেন সর্বশক্তিমান। তিনি চাইলে একজন যক্ষ্মা রুগীকেও রোযা রাখার শক্তি দিতে পারেন। অতএব ফিদিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, (রোযা রাখার) সেই শক্তি যেন লাভ হয় এবং তা আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপাতেই হয়ে থাকে। তাই আমার মতে, কত-না ভালো হয় যদি, মানুষ এভাবে দোয়া করে যে, হে আমার আল্লাহ্‌! এ তোমার এক কল্যাণময় মাস। আমি এ মাসে বঞ্চিত রয়ে যাচ্ছি আর আমি এ-ও জানি না যে, আগামী বছর জীবিত থাকব কি-না অথবা আমার রয়ে যাওয়া এ রোযাগুলো পুনরায় রাখতে পারব কি-না। এভাবে যদি তাঁর কাছে সামর্থ্য যাচনা করে আমার বিশ্বাস, এমন হৃদয়কে আল্লাহ্‌ তা'লা শক্তি প্রদান করবেন।

খোদা তা'লা চাইলে অন্যান্য জাতির ন্যায় এই উম্মতে কোন বিধিনিষেধ রাখতেন না। কিন্তু তিনি এই বিধিনিষেধ উপকারার্থে রেখেছেন। বস্তুত, আমার মতে মানুষ যখন সততা ও পরিপূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহ্‌ তা'লার সমীপে প্রার্থন করে- 'হে আল্লাহ্‌! এই মাসে আমাকে বঞ্চিত রেখো না।' তখন আল্লাহ্‌ তা'লা এমন ব্যক্তিকে বঞ্চিত রাখেন না। আর এমতাবস্থায় মানুষ যদি রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে সেই অসুস্থতা তার জন্য রহমত স্বরূপ হয়ে থাকে। কেননা প্রত্যেক কর্মের ফলাফল নির্ভর করে সংকল্প বা সদিচ্ছার উপর। মোমেনের উচিত নিজের সর্বস্ব উজাড় করে খোদার পথে আত্মবিলীনতা প্রমাণ করা। যে ব্যক্তি রোযা থেকে বঞ্চিত থাকে, কিন্তু তার অন্তরে এই ব্যকুলতা থেকে থাকে যে যদি আমি সুস্থ থাকতাম তবে রোযা রাখতাম! আর এমতাবস্থায় মানুষ যদি রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে যায়, তবে সেই অসুস্থতা তার জন্য কৃপা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা প্রতিটি কর্ম তার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি রোযা থেকে বঞ্চিত থাকে কিন্তু অন্তরে এই বেদনা ছিল যে, যদি সুস্থ থাকতাম আর রোযা রাখতে পারতাম! আর সেই অসুস্থতার জন্য সে দুঃখিত হয়, তবে ফিরিশতারা তার জন্য রোযা রাখবেন। তবে শর্ত হল সে যেন সুযোগসন্ধানী না হয়। এমনটি হলে খোদা তা'লা তাকে মোটেই পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখবেন না।

এটি একটি সূক্ষ্ম বিষয়। যদি কোন ব্যক্তির (নিজের অলসতার কারণে) জন্য রোযা কষ্টকর হয় আর নিজের মনে এই ধারণা করে বসে , 'আমি তো অসুস্থ, আমার স্বাস্থ্য এমন যে এক বেলা না খেলে অমুক অমুক অসুবিধা হবে, তবে এমন ব্যক্তি যে কি না খোদার আশীর্বাদকে নিজের জন্য অসহনীয় মনে করে, সে কিভাবে এই পুণ্য লাভের যোগ্য হবে? তবে যে ব্যক্তির হৃদয় এ বিষয় নিয়ে আনন্দিত যে রমযান এসেছে আর এই মাসের আগমণের প্রতীক্ষায় ছিলাম যাতে রোযা রাখতে পারি, কিন্তু সে অসুস্থতার কারণে রোযা রাখতে পারে নি, এমন ব্যক্তি উর্দ্ধলোকে রোযা থেকে বঞ্চিত হবে না। এই পৃথিবীতে অনেক মানুষ ছুতো খুঁজে বেড়ায়। তারা মনে করে, আমরা যেভাবে জগদ্বাসীকে ঠকাই, ঠিক সেভাবে খোদার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করবে। ছুতো সন্ধানী ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকেই

এরপর ৬ পাতায়...

রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর বাণী

১২১৬) হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন মাসউদ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আমি নবী (সা.) কে তিনি নামায রত অবস্থায় সালাম করতাম আর তিনি তার উত্তর দিতেন। আমরা যখন (ইথিওপিয়া হিজরত থেকে) ফিরে এলাম, তখন অমি তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। (পরে) তিনি বললেন- নামাযে এক প্রকার ব্যস্ততা থাকে।

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্‌ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) তাঁর কোন কাজে আমাকে প্রেরণ করেন। আমি সেই কাজ শেষ করে ফিরে আসি। আমি নবী (সা.) এর কাছে এসে তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি আমাকে উত্তর দিলেন না। আমার মনে যে ধারণার উদ্রেক হল তা আল্লাহ্‌ই উত্তম জানেন। আমি মনে মনে বললাম, আমি দেরি করে ফেলেছি, তাই হয়তো তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। এরপর আমি পুনরায় সালাম করলাম। তিনি আমাকে উত্তর দিলেন না। আমার মনে আগের বারের থেকে বেশি আঘাত লাগল। আমি পুনরায় সালাম করলে তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, আমি নামায পড়ছিলাম, যা আমাকে উত্তর দিতে বাধা দিচ্ছিল।

ব্যাখ্যা: হযরত সৈয়্যদ জায়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্‌ শাহ সাহেব বলেন: কিছু কিছু ফিকাহবিদের নিকট মুখে 'আসসালামো আলাইকুম' উচ্চারণ না করে দোয়া হিসেবে মনে মনে সালামের উত্তর দিয়ে দেওয়া উচিত কিম্বা ইঙ্গিতে উত্তর দেওয়া উচিত। ইমাম বুখারী এই মতকে পূর্ণত খণ্ডন করেছেন। রেওয়াত নম্বর ১২১৬, ১২১৭ থেকে প্রকাশিত যে আঁ হযরত (সা.) নামায শেষ করে সালামের উত্তর দিয়েছেন। জমহুরেরও এই একই অবস্থান।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন উহুদের শহীদদের দাফন করার জন্য আসেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তাদেরকে তাদের ক্ষতসহ দাফন করে দাও কেননা আমি তাদের ওপর সাক্ষী। যে মুসলমানকেই আল্লাহ্‌র পথে আহত করা হয় সে কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে, তার রক্ত বইতে থাকবে আর তার দেহের রং হবে জাফরানের ন্যায় আর তার দেহের সুগন্ধ হবে কস্তুরির ন্যায়।

'হে আনসারের দল! আমি সাবেত বিন দাহ্‌দাহ্, (তোমরা) আমার কাছে আসো। মুহাম্মদ (সা.) যদি সত্যিকার অর্থেই নিহত করে থাকেন তাহলে (স্মরণ রেখো) আল্লাহ্ তা'লা জীবিত আছেন, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। কাজেই, তোমরা তোমাদের ধর্মের খাতিরে লড়াই করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং তোমাদের সাহায্য করবেন।'

একটি রেওয়ায়েতে অনুসারে, মহানবী (সা.) বলেন, মুখায়ররিক ইহুদীদের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছে আর পারস্যবাসীদের মাঝে সালমান এগিয়ে গিয়েছে এবং হাবশীদের মধ্যে বেলাল সর্বাগ্রে।

আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার সাথে পিপাসার্ত –ক্ষুধার্ত অবস্থায় মিলিত হওয়ার চেয়ে পরিতৃপ্ত ও ভরাপেটে মিলিত হওয়া আমার কাছে বেশি প্রিয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) উহুদের দিন সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করেন। তাঁকে দাফন করার সময় মহানবী (সা.) বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) এবং আমর বিন জমুহ (রা.)–কে একই কবরে দাফন করো কেননা তাদের উভয়ের মাঝে নিষ্ঠা ও ভালবাসা ছিল।

হযরত ইমাম শাফী (রহ.) বর্ণনা করেন, নিরবচ্ছিন্ন রেওয়ায়েত থেকে এটি দৃঢ়ভাবে প্রতিয়মান হয় যে, মহানবী (সা.) উহুদের শহিদদের জানাযা পড়েন নি। আর যে সব রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) শহিদদের জানাযা পড়েছেন এবং হযরত হামযা (রা.)র জানাযা সত্তরবার পড়েছেন– সেগুলো সঠিক নয়। হযরত উকবা বিন আমর (রা.)–এর রেওয়ায়েত হলো 'মহানবী (সা.) ৮ বছর পর শহিদদের জানাযা পড়েছেন।'

উহদের যুদ্ধে সাহাবাগণের শাহাদতের ঘটনাবলী এবং রসুলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা ও ভালবাসার দৃষ্টান্তসমূহ।

মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে দোয়ার আহ্বান।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৬ ফেব্রুয়ারী , ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (১৬ তবলীগ, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, উহুদের যুদ্ধের ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)–এর জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক এবং তাঁর (সা.) প্রতি সাহাবীদের ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার কথা বর্ণনা করা হচ্ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় হযরত খারেজা বিন যায়েদের শাহাদতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত খারেজা (রা.) উহুদের যুদ্ধে খুবই সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদতের মর্যাদা অর্জন করেন। তিনি বর্ষার লক্ষে পরিণত হন এবং ১৩টির অধিক আঘাত পান। তিনি (রা.) আঘাতের কারণে অবসন্ন অবস্থায় পড়ে ছিলেন, এ অবস্থায় সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা তার পাশ দিয়ে যায়। সে তাকে চিনতে পার এবংআক্রমণ করে শহীদ করে দেয়। এরপর তার (রা.) লাশকে বিকৃতও করে আর বলে যে, তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা বদরের যুদ্ধে আবু আলীকে অর্থাৎ আমার আমার পিতা উমাইয়্যা বিন খালফকে হত্যা করেছিল। এখন আমি সুযোগ পেয়েছি, মুহাম্মদের (সা.) এই সঙ্গীদের মধ্যে হতে উত্তম সঙ্গীদের হত্যা করব এবং নিজের মনকে প্রবোধ দিবো। সে হযরত ইবনে কাওক্বাল, হযরত খারেজা বিন যায়েদ এবং হযরত অওস বিন আরক্বামকে শহীদ করে। হযরত খারেজা এবং হযরত সা'দ বিন রবীকে একই কবরে দাফন করা হয় যিনি তার চাচাতো ভাই ছিলেন।

(আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩–৪)

রেওয়াত রয়েছে যে, উহুদের দিন হযরত আব্বাস বিন উবাদা (রা.) উচ্চ স্বরে বলছিলেন যে, হে মুসলমানেরা! আল্লাহ্ এবং তোমাদের নবীর সাথে সংযুক্ত থাকো, তোমরা যে বিপদ নিপতিত হয়েছ তা (শুধুমাত্র) তোমাদের নবীর অবাধ্যতার কারণে এসেছে। তিনি তোমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধারণ করোনি। অতঃপর হযরত আব্বাস বিন উবাদা (রা.) নিজের শিরস্ত্রাণ ও বর্ম খুলে ফেলেন এবং হযরত খারেজা বিন যায়েদকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনার কি এটির প্রয়োজন আছে? খারেজা বলেন না, তুমি যার বাসনা করছো আমিও তা–ই চাই, অর্থাৎ শাহাদাত। এরপর তারা সবাই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। হযরত আব্বাস বিন উবাদা (রা.) বলতেন যে, আমাদের চোখের সামনে যদি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)–এর কোনো কষ্ট হয় তাহলে নিজ প্রভুর সন্নিধানে আমাদের কোনো ওজর গৃহীত হবে না। আর হযরত খারেজা (রা.)বলতেন যে, আমাদের প্রভুর সন্নিধানে আমাদের কোনো ওজরও গৃহীত হবে না এবং কোন যুক্তিও না। হযরত আব্বাস বিন উবাদাকে সুফিয়ান বিন আব্দে শামস সালামী শহীদ করেছিল আর খারেজা বিন যায়েদের শরীরে তিরের কারণে ১০ টির অধিক আঘাত লেগেছিল। (কিতাবুল মাগাযি, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২৭–২২৮)

অপর এক রওয়ায়েতে রয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মালেক বিন দুখশুম হযরত খারেজা বিন যায়েদের পাশ দিয়ে যান। হযরত খারেজা আঘাতে জর্জরিত অবস্থায় বসে ছিলেন। তিনি প্রায় ১৩টি প্রাণঘাতী আঘাত পেয়েছিলেন। হযরত মালেক তাকে বলেন, আপনি কি জানেন না যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে শহীদ করা হয়েছে, (এটি কাফেরদের দ্বিতীয় আক্রমণের কথা হচ্ছে)। হযরত খারেজা (রা.) বলেন, তাঁকে (সা.) শহীদ করা হলেও নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা'লা জীবিত আছেন; তিনি মৃত্যু বরণ করবেন না। এই ছিল তাদের (অর্থাৎ সাহাবীদের) ঈমান। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, তাই তোমরা নিজ ধর্মের জন্য যুদ্ধ করো। (কিতাবুল মাগাযি, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৪৩)

কিন্তু এখন শত্রু তোমাদের সাথে লড়াই করছে তাই তোমরাও লড়াই করো। আমাদেরও কাজ হলো আল্লাহ তা'লার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা।

এরপর হযরত শাম্মাস বিন উসমানের শাহাদতের ঘটনা রয়েছে। হযরত শাম্মাস বিন উসমান বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেছেন। মুহাম্মদ (সা.) বলেন, আমি শাম্মাস বিন উসমানকে ঢালের ন্যায় পেয়েছি। মহানবী (সা.) ডানে-বামে যেখানেই তাকাতেন শাম্মাসকে সেখানেই পেতেন, যিনি উহুদের যুদ্ধে নিজ তরবারি দ্বারা শত্রুকে পতিহত করছিলেন। এমনকি মহানবী (সা.) অচেতন হয়ে যান। যখন তাঁর (সা.) ওপর আক্রমণ করা হয় এবং পাথর এসে লাগে তখন হযরত শাম্মাস নিজেকে মহানবী (সা.)-এর সামনে ঢাল বানিয়ে নিয়েছিলেন। এমনকি তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং তাকে এ অবস্থায় উঠিয়ে মদিনায় নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থাৎ হযরত শাম্মাসকে উঠিয়ে মদিনায় নিয়ে যাওয়া হয়। তার মাঝে তখনও প্রাণের স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। তাকে (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)র ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। হযরত উম্মে সালমা বলেন, আমার চাচাতো ভাইকে কি আমার পরিবর্তে অন্য কারো কাছে নিয়ে যাওয়া হবে? তখন মহানবী (সা.) বলেন, তাকে (রা.) উঠিয়ে হযরত উম্মে সালমা-র বাড়িতে নিয়ে যাও। অতঃপর তাকে (রা.) সেখানেই নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি (রা.) তার বাড়িতেই মৃত্যু বরণ করেন। তিনি উহুদের যুদ্ধ থেকে আহতাবস্থায় এসেছিলেন। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত শাম্মাসকে উহুদের প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে সেই কাপড়েই সমাহিত করা হয়। মদিনায় দুদিন পর তিনি মৃত্যু বরণ করেন, কিন্তু তাকে সমাহিত করা হয় উহুদের প্রান্তরে। যুদ্ধ শেষে তাকে (রা.) যখন আহতাবস্থায় উঠিয়ে মদিনায় নিয়ে আসা হয় তখন সেখানে এক দিন ও এক রাত তিনি জীবিত ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, সেই অবস্থায় তিনি কোনো খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করেননি। তিনি চরম দুর্বল ছিলেন, বরং অচেতন অবস্থায় ছিলেন। মৃত্যুকালে হযরত শাম্মাসের বয়স ছিল ৩৪ বছর, অর্থাৎ তিনি তখন যুবক ছিলেন।

ইতিহাস হযরত শাম্মাস বিন উসমান (রা.) সম্পর্কে এমন ঘটনা সংরক্ষণ করেছে যা রসূলপ্রেমের প্রবাদ হয়ে গেছে এবং তা ইসলামের জন্য আত্মত্যাগের উৎকৃষ্টতম মান প্রতিষ্ঠারও একটি উদাহরণ। উহুদের যুদ্ধে যেখানে হযরত তালহা (রা.)-এর রসূলপ্রেম ও ভালোবাসার ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি (রা.) কত দৃঢ়তার সাথে নিজের হাত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার সামনে রেখে দেন, যেন তাঁর গায়ে কোনো তির বিদ্ধ হতে না পারে, সেখানে হযরত শাম্মাস (রা.)ও বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। হযরত শাম্মাস মহানবী (সা.)-এর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং সকল আঘাত নিজের ওপর নিয়ে নেন। মহানবী (সা.) হযরত শাম্মাস সম্পর্কে বলেন, শাম্মাসকে আমি যদি কোনো কিছুর সাথে তুলনা করতে চাই তাহলে ঢালের সাথে তুলনা করবো, কেননা সে উহুদের প্রান্তরে আমার জন্য এক ঢালই তো হয়ে গিয়েছিল। সে আমার সামনে-পেছনে, ডানে-বামে নিরাপত্তা নিশ্চিৎকরার মানসে আমৃত্যু লড়াই করে গিয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন, আমি যেখানেই তাকিয়েছি সেখানেই শাম্মাসকে প্রবল বিক্রমে লড়াই করতে দেখেছি। শত্রুরা যখন মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে সমর্থ হয় এবং তিনি (সা.) অচেতন হয়ে পড়ে যান তখনও শাম্মাস (রা.)-ই ঢাল হয়ে সামনে ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন, এমনকি তিনি (রা.) নিজে গুরুতর আহত হন। সেই অবস্থাতেই তাকে মদিনায় নিয়ে আসা হয়। হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, সে আমার চাচাতো ভাই। আমি তার কাছের মানুষ এবং আত্মীয়। তাই আমার বাড়িতেই তার সেবা-শুশ্রূষা এবং চিকিৎসা প্রভৃতি হওয়া উচিত। কিন্তু ক্ষত গভীর হওয়ার কারণে দেড়-দুই দিন পরেই তার মৃত্যু হয়। মহানবী (সা.) বলেন, শাম্মাসকেও যেন তার কাপড়েই সমাহিত করা হয় যেভাবে অন্য শহীদদের করা হয়েছে। (আত্তাবাকতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৬)

অতঃপর হযরত নু'মান বিন মালেক (রা.)-এর শাহাদতের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। হযরত নু'মান বিন মালেক (রা.) বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা তাকে শহীদ করেছিল। অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, আবান বিন সাঈদ হযরত নু'মান বিন মালেককে (রা.) শহীদ করেছিল। হযরত নু'মান বিন মালেক, হযরত মুজাযের বিন যিয়াদ এবং হযরত উবাদা বিন হাস্‌সাস (রা.)-কে উহুদের যুদ্ধের সময় একই কবরে সমাহিত করা হয়েছিল। (আত্তাবাকতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ:৪১৪)

মহানবী (সা.)-এর উহুদের যুদ্ধের জন্য যাত্রা ও আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের সাথে তাঁর (সা.) পরামর্শ করার সময় হযরত নু'মান বিন মালেক (রা.) খুবই দৃঢ়তার সাথে নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.), খোদার কসম! আমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবো'। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, সেটি কীভাবে? তখন হযরত নু'মান (রা.) নিবেদন করেন 'এর কারণ হলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই এবং আপনি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.), আর আমি যুদ্ধ থেকে কখনো পলায়ন করবো না। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি সত্য বলেছো। এরপর তিনি সেদিনই শহীদ হন। (উসদুল গাবাহ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩২২)

খালেদ বিন আবু মালেক জা'দী বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতার গ্রন্থে এই রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, হযরত নু'মান বিন কওকল আনসারী দোয়া করেছিলেন 'হে আমার প্রভু তোমার কসম! সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই আমি আমার এই খোঁড়া পা নিয়ে জান্নাতের সবুজ-শ্যামল প্রান্তরে হাঁটতে থাকবো।' এরপর তিনি সেদিনই শাহাদত বরণ করেন। মহানবী (সা.) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া গ্রহণ করেছেন, [মহানবী (সা.) দিব্যদর্শনে দেখেছেন আর এটি আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বলেছেন] তিনি বলেন, আমি তাকে দেখেছি যে, 'সে মাধ্যমে জান্নাতে দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছিল এবং তার মধ্যে কোনো প্রকার খঞ্জত্ব ছিল না।' (মারেফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৭)

এরপর রয়েছে হযরত সাবেত বিন দাহ্‌দাহ্ (রা.)'র বিবরণ। তিনিও উহুদের যুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন, তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের গুজব ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ এই সংবাদ শুনে বলে যে, 'মহানবী (সা.) যেহেতু শহীদ হয়ে গেছেন তাই এখন তোমরা তোমাদের জাতির নিকট ফিরে যাও তারা তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিবে। তখন অন্যরা বলে উঠে 'মহানবী (সা.) যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে কি তোমরা তোমাদের নবীর আনীত ধর্ম এবং তাঁর শিক্ষার জন্য আমৃত্যু লড়াই করবে না?' হযরত সাবেত বিন দাহ্‌দাহ্ (রা.) আনসারদের উদ্দেশ্যে বলেন 'হে আনসারের দল! যদি মুহাম্মদ (সা.) শহীদ হয়ে যান তবে, আল্লাহ্ তা'লা তো জীবিত আছেন, তাঁকে মৃত্যু স্পর্শ করতে পারে না। নিজেদের ধর্মের খাতিরে যুদ্ধ করো। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে বিজয় ও সফলতা দানকারী। একথা শুনে আনসারী মুসলমানদের একটি দল দণ্ডায়মান হয় এবং তারা হযরত সাবেত (রা.)'র সাথে মিলিত হয়ে মুশরিকদের সেই দলটির ওপর আক্রমন করে যাতে খালিদ বিন ওয়ালীদ, ইকরামা বিন আবু জাহল, আমর বিন আস এবং যির্‌রার বিন খাত্তাব ছিল। মুসলমানদের এই ছোট্ট একটি দলকে আক্রমণ করতে দেখে খালিদ বিন ওয়ালীদ তাদের ওপর জোরালো পাল্টা আক্রমন করে এবং হযরত সাবেত বিন দাহ্‌দাহ্ (রা.) এবং তার আনসারী সঙ্গীদের শহীদ করে দেয়। (আসসীররাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৯)

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর খাত্‌মী বলেন 'সাবেত বিন দাহ্‌দাহ্ উহুদের দিন সম্মুখে অগ্রসর হন আর মুসলমানরা তখন ছত্রভঙ্গ ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। তিনি উঁচু স্বরে ডাকতে থাকেন 'হে আনসারের দল! আমি সাবেত বিন দাহ্‌দাহ্, (তোমরা) আমার কাছে আসো। মুহাম্মদ (সা.) যদি সত্যিকার অর্থেই নিহত করে থাকেন তাহলে (স্মরণ রেখো) আল্লাহ্ তা'লা জীবিত আছেন, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। কাজেই, তোমরা তোমাদের ধর্মের খাতিরে লড়াই করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং তোমাদের সাহায্য করবেন।'

এরপর (তার এই আহবান শুনে) আনসারের একটি দল তার নিকট সমবেত হয়। তিনি মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে কাফিরদের ওপর আক্রমণ করতে থাকেন। তাদেরকে মোকাবিলায় কাফিরদের তুখোড় যুদ্ধবাজ সেনাদল এগিয়ে আসে যাদের মধ্যে তাদের কয়েকজন নেতা খালেদ বিন ওয়ালীদ, আমর বিন আস, ইকরামা বিন আবু জাহ্‌ল এবং যির্‌রার বিন খাত্তাব ছিল। এরা সবাই সম্মিলিতভাবে তাদের ওপর আক্রমন রচনা করে। হযরত সাবেত (রা.)'র ওপর খালেদ বিন ওয়ালীদ বর্শা দিয়ে আক্রমণ করে এবং বর্শা তার দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। হযরত সাবেত (রা.) শহীদ হয়ে (মাটিতে) লুটিয়ে পড়েন এবং তার সাথে থাকা অন্যান্য আনসারও শাহাদত বরণ করেন। একারণেই বলা হয় যে, সেদিন মুসলমানদের মধ্যে সবার শেষে তারাই শহীদ হয়েছেন।

এক রেওয়ায়েত অনুসারে খালিদ সামনে অগ্রসর হয়ে বর্শা নিক্ষেপ করে যার ফলে হযরত সাবেত (রা.) আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। লোকজন (তাকে) তুলে এনে চিকিৎসা শুরু করে। রেওয়ায়েত অনুসারে সে সময় রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন, কিন্তু হুদায়বিয়ার যুদ্ধের পর ক্ষতস্থান হঠাৎ ফেটে যায় এবং এ কারণেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হযরত জাবের বিন সামুরাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত সাবেত বিন দাহ্‌দাহ্ (রা.)'র জানাযার সাথে পায়ে হেঁটে যান এবং ঘোড়ায় চড়ে ফেরত আসেন।

(উসদুল গাবা ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৪০) (সেইরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৫২) (তিরমিযি, আবওয়াবুল জানায়েজ, হাদীস-১০১৪)

অর্থাৎ হুদায়বিয়ার যুদ্ধের পর (ক্ষতস্থান) ফেটে গিয়েছে মর্মে যে রেওয়ায়েত রয়েছে সেটি দুর্বল মনে হয়; (বরং) সেই ঘটনার সময়ই (তিনি) শহীদ হয়েছিলেন।

একই পরিবারের চারজন সদস্যের শহীদ হবার উল্লেখ পাওয়া যায়। সাবেত বিন ওয়াক্‌শ (রা.) এবং রিফা' বিন ওয়াক্‌শ (রা.) উভয় ভাই উহুদের দিন শহীদ হয়েছিলেন। আর তাদের সাথে সাবেত বিন ওয়াক্‌শ (রা.)'র দুই পুত্র সালামা বিন সাবেত (রা.) এবং আমর বিন সাবেত (রা.)ও শহীদ হয়েছিলেন। আমর বিন সাবেত (রা.)'র নাম উসায়রামও বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সবার সম্পর্ক ছিল আনসারের বনু আব্দুল আশ'আল গোত্রের সাথে। (উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৫৮-৪৫৯)

রিফা' বিন ওয়াক্‌শ (রা.) একজন বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন। রিফা' এবং সাবেত (রা.) উভয় ভাই উহুদের যুদ্ধের দিন একত্রে যুদ্ধ করেছেন। রিফা' (রা.)-কে খালিদ বিন ওয়ালীদ শহীদ করেছে। (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৮)

ইবনে ইসহাকের ভাষ্য অনুসারে সাবেত বিন ওয়াক্‌শ (রা.)'র শাহাদতের ঘটনা হলো, মহানবী (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হয়ে যান তখন সাবেত বিন ওয়াক্‌শ এবং হুসাইল বিন জাবের, (যার নাম ছিল ইয়ামান এবং তিনি হুযায়ফা বিন ইয়ামানের পিতা ছিলেন,) তারা উভয়েই বয়োবৃদ্ধ ছিলেন এবং সেই দু র্গে ছিলেন যেখানে নিরাপত্তার জন্য মুসলমান নারী ও শিশুরা আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের একজন অপরজনকে বলে, তুমি কিসের অপেক্ষা করছ? আমাদের তো আর বেশি আয়ু নেই। আজ যদি আমরা মারা না যাই তাহলে কাল

অবশ্যই মারা যাব। আমাদের কি নিজেদের তরবারি হাতে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে যোগ দেওয়া উচিত না? হয়তো আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শাহাদত লাভের সৌভাগ্য দান করবেন। এরপর এই দুজন তরবারি নিয়ে কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং লোকজনের সাথে মিশে যান অর্থাৎ যুদ্ধে যোগদান করেন। (আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৫৩৭-৫৩৮)

আমর বিন সাবেত ওয়াক্শ আনসারী উসায়রাম নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন, হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান-এর বোন ছিল তার মাতা। তিনি উহুদের যুদ্ধের দিন ফজরের নামাযের পর মুসলমান হন। (ফজরের) নামায পড়েন নি; এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করে মহানবী (সা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। মুসলমানদের সাথে জিহাদ তথা যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৫৮)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেসকরেন, আমাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলো যে কখনো নামায পড়ে নি অথচ সে জান্নাতী; লোকজন এ সম্পর্কে অনবহিত ছিল। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে যে, সে কে? তখন তিনি (সা.) বলেন, সে হলো উসায়রাম অর্থাৎ আমর বিন সাবেত। এক বর্ণনায় আছে, উসায়রাম তার জাতির সামনে ইসলামকে অস্বীকার করতো। যখন উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) মহানবী (সা.) রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন, তখন উসায়রামের নিকট ইসলামের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে যায় তখন সে ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর নিজের তরবারি নিয়ে স্ব জাতির কাছে যায় এবং লোকদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করে। এমনকি উপর্যুপরি আঘাতে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়েন। তখন বনু আব্দিল আশ'আলের লোকজন তাদের শহীদদের লাশ অনুসন্ধান করছিল; হঠাৎ করে তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। (তারা) বিস্মিত হয়ে বলে, এ তো উসায়রাম, কিন্তু তাকে এখানে কে নিয়ে এসেছে? আমরা তো তাকে রেখে এসেছিলাম; সে তো ইসলামের অস্বীকারকারী। এরপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করে যে, হে উসায়রাম! তুমি এখানে কীভাবে এলে? তোমার জাতিগত আত্মাভিমান নাকি ইসলামের প্রতি আকর্ষণের কারণে? তিনি বলেন, ইসলামের প্রতি আকর্ষণের কারণে অর্থাৎ ইসলামকে আমি সত্য বলে মেনেছি বিধায় আমি (এখানে) এসেছি। আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হয়েছি এবং নিজ তরবারি নিয়ে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে থাকি । এরপর আমার সে অবস্থা হয় যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো। অতঃপর তিনি লোকদের হাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মহানবী (সা.)-এর নিকট তার উল্লেখ করা হলে তিনি (সা.) বলেন, সে জান্নাতী।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৫০১)

আমি তখন এ কারণে থেমে গিয়েছিলাম যে, যেখানে লেখা ছিল- তিনি (সা.) বলেন, সে জান্নাতী; সেখানে রাযিয়াল্লাহু আনহু লেখা ছিল অথচ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখা উচিত ছিল। তাই আমার সন্দেহ হচ্ছিল যে, কোনো সাহাবী না আবার একথা বলে থাকবে কিন্তু যাহোক, এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, সে জান্নাতী।

আর পূর্ববর্তী রেওয়ায়েতও এ আঙ্গিকে সঠিক মনে হয় যে, নামায না পড়েই যে জান্নাতে চলে গিয়েছে সে হলো এই ব্যক্তি শেষ মুহূর্তে এসে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।

এ বংশের চতুর্থ শহীদ ছিলেন হযরত সালমা বিন সাবিত (রা.)। হযরত সালামা বিন সাবিত (রা.)-এর পুরো নাম হলো সালামা বিন সাবিত বিন ওয়াকশ। হযরত সালামা (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান হযরত সালামা (রা.)-কে শহীদ করেছিলেন। হযরত সালামা (রা.)-এর পিতা হযরত সাবিত বিন ওয়াকশ এবং চাচা হযরত রিফা বিন ওয়াকশ আর তার ভাই হযরত আমর বিন সাবিত-ও উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। এই বংশের অনেক সদস্য উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩)

মুখায়ররিক নামে বনূ নযীর গোত্রের একজন ইহুদী ছিল । মুহাম্মদ বিন উমর আসলামী বর্ণনা করেন, সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং কেউ কেউ বলে, সে বনূ কায়নুকা গোত্রের সদস্য ছিল। কারো কারো মতে, সে বনূ সা'লাবা বিন ফিদইউন-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ব্যক্তি ইহুদীদের বড়ো আলেমদের মাঝে একজন ছিল। সে নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে মহানবী (সা.)-এর বৈশিষ্টাবলী দেখে তাঁকে সনাক্ত করতে পেরেছিল কিন্তু নিজের ধর্মের প্রতি ভালোবাসা তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর সে ঈমান আনয়ন করে নি। শনিবার দিন সে বলে, হে ইহুদীদের দল! আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা জানো যে, মুহাম্মদ (সা.)-কে সাহায্য করা তোমাদের ওপর আবশ্যক। অর্থাৎ, সৈন্যবাহিনী জুমুআর দিনে উহুদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় আর সে পরদিন তথা শনিবার বলে। লোকেরা বলে, আজ তো সাবাতের দিন। আজকে কোনো যুদ্ধবিগ্রহ চলবে না। সে বলে, তোমাদের জন্য কোনো সাবাত নেই। অতঃপর নিজ জাতির লোকদের বলে, আমাকে যদি আজ হত্যা করা হয় তবে আমার সমস্ত সম্পদ মুহাম্মদের (সা.) হবে আর তিনি যেভাবে চাইবেন তা ব্যয় করবে। এরপর নিজের তরবারি হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। যুদ্ধ চলাকালে সে লড়াই করতে করতে যখন শহীদ হয়ে যায়। তখন মহানবী (সা.) বলেন, মুখায়ররিক ইহুদীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

একটি রেওয়ায়েতে অনুসারে, মহানবী (সা.) বলেন, মুখায়ররিক ইহুদীদের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছে আর পারস্যবাসীদের মাঝে সালমান এগিয়ে গিয়েছে এবং হাবশীদের মধ্যে বেলাল সর্বাগ্রে । (সুবালুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১২)

একজন জীবনীকার মুখায়ররিক সম্বন্ধে লিখেছেন, একটি মত হলো, সে ইসলামের জন্য কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে তার স্বপক্ষে প্রশংসামূলক বাক্য নিঃসৃত হয়, যার ভিত্তিতে বহু জীবনীকার ও ইতিহাসবিদ মুখায়ররিককে মুসলমান গণ্য করেছে যাদের মাঝে ইবনে হিশাম, সুহায়লী, ইবনে হাজর, ইবনে কাসীর, বলাজরী , কাযী আইয়ায, ইমাম নববী এবং অন্যান্যরা অন্তর্ভুক্ত।

(দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ৬০৪)

অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহশ (রা.)-এর উল্লেখ রয়েছে। ইতিহাসে লেখা আছে, খোদা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর ভালোবাসা তাকে সমগ্র পৃথিবীর প্রতি বিমুখ করে দিয়েছিল। তার যদি কোনো আকাঙ্ক্ষা থেকে থাকে তবে তা কেবল এটিই যে, প্রিয় প্রাণ যেন কোনোভাবে খোদার পথে উৎসর্গীত হয়ে যান। সুতরাং তার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে এবং মুজাদ্দাউন ফিল্লাহ্ অর্থাৎ খোদার পথে কান কাটা- তাঁর নামের স্বতন্ত্র চিহ্ন হিসেবে পরিচিত লাভ করে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের শাহাদাত লাভের পূর্বে তার দোয়া গৃহীত হওয়া সংক্রান্ত একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। ইসহাক বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ আমার পিতা অর্থাৎ সা'দ-কে উহুদের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, চলো! আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করি। সুতরাং তারা উভয়ে (দোয়া করার জন্য) একইদিকে চলে যান। প্রথমে হযরত সা'দ দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! আগামীকাল যখন আমি শত্রুর মুখোমুখি হবো তখন যেন এমন ব্যক্তির সাথে আমার মোকাবিলা হয় যে হবে আক্রমনে কঠোর ও সাহসী প্রতিদ্বন্দী আর যার প্রতাপ ছেয়ে থাকবে। সুতরাং আমি তার সাথে লড়ব এবং তাকে তোমার পথে হত্যা করব ও তার হাতিয়ারসমূহ করায়ত্ত করব। এটি শুনে আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ আমীন বলেন। এটি ছিল প্রথম ব্যক্তির দোয়া, অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এ দোয়া করেন। এরপর আব্দুল্লাহ বিন জাহাশের দোয়া এটি ছিল, হে আল্লাহ্! আগামীকাল (যুদ্ধক্ষেত্রে) আমি যেন এমন ব্যক্তির মুখোমুখি হই যে কঠোর প্রতিদ্বন্দী হবে আর যার প্রতাপ হবে অত্যন্ত গভীর। আমি তোমার খাতিরে তার সাথে যুদ্ধ করব এবং সে-ও আমার সাথে যুদ্ধ করবে। সে বিজয়ী হয়ে আমাকে হত্যা করবে আর ধরে আমার নাক, কান কেটে নেবে। এরপর যখন আমি তোমার সকাশে উপস্থিত হবো তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, হে আব্দুল্লাহ্! কার রাস্তায় তোমার নাক ও দুই কান কর্তন করা হয়েছে? আমি নিবেদন করব, হে আল্লাহ্! তোমার ও তোমার রসূলের রাস্তায়। উত্তরে তুমি এটি বলবে, তুমি সত্য বলেছ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কাছে এ বাসনা ব্যক্ত করবেন আর তখন, আল্লাহ্ও বলবে, তুমি সত্য বলেছ। হযরত সা'দ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের দোয়া আমার দোয়া থেকে উত্তম ছিল। কেননা আমি দেখেছি তার নাক ও দুটি কান এক সুতায় ঝুলন্ত অবস্থায় দেখি অর্থাৎ কর্তিত অবস্থায় দেখি আর তা একটি সূতোয় ঝুলছিল। (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯৪-১৯৬)

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি সাহাবীদের ভালোবাসার ধরণ ছিল বড় অভিনব। হযরত মুত্তালিব বিন আব্দুল্লাহ বিন হানতাবএর রেওয়ায়েত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যেদিন উহুদ অভিমুখে রওয়ানা হন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) পথিমধ্যে মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা শায়খাইনের পাশে রাত্রিযাপন করেন যেখানে উম্মে সালামা একটি ভুনা কাঁধের মাংস আনেন যা থেকে রসুলুল্লাহ্ (সা.) খান। অনুরূপভাবে নাবিয আনেন এবং তিনি (সা.) নাবিযও (খেজুর দ্বারা প্রস্তুতকৃত পানীয়) পান করেন। এটিও এক ধরনের খাদ্য যা হারীরার ন্যায় তরল হয়ে থাকে। অতঃপর এক ব্যক্তি সে নাবিযের পেয়ালা নেন ও তা থেকে অল্প পান করেন, এরপর সে পেয়ালা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ নেন আর পুরোটাই খেয়ে ফেলেন। এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের নিকট নিবেদন করেন, আমাকেও কিছুটা দাও। তুমি কি জানো যে, কাল সকালে তোমার জন্য কী অপেক্ষা করছে? অর্থাৎ যুদ্ধ হবে, কেউ জানে না কে শহীদ হবে আর কে জীবিত থাকবে? হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ বলেন, হ্যাঁ আমি জানি; আমার শাহাদাত লাভের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। অতঃপর বলেন, আল্লাহ্ তা'লার সাথে পিপাসার্ত -ক্ষুধার্ত অবস্থায় মিলিত হওয়ার চেয়ে পরিতৃপ্ত ও ভরাপেটে মিলিত হওয়া আমার কাছে বেশি প্রিয়। (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৭)

আল্লাহ্ তা'লার সাথে মিলিত তো হতেই হবে তাই (আমার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে) তৃপ্তির সাথে খেয়েদেয়ে মিলিত হবো। এটি আল্লাহ্ তা'লার নিকট আমার প্রত্যাশা। এজন্য আমি এটি পান করছি। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সাহাবীদের ভালবাসার রীতি বড়ই চিত্তাকর্ষক আর এর জন্য তাদের প্রস্তুতির ধরনও অভিনব।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ ও হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালেবকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল। হযরত হামযা আব্দুল্লাহ বিন জাহাশের মামা ছিলেন আর শাহাদাতের সময় তার বয়স চল্লিশের কিছু উর্ধ্বে ছিল। রসূলুল্লাহ্

(সা.) তার রেখে যাওয়া সম্পদের অভিভাবক হন আর তিনি (সা.) খায়বারে তার ছেলেদের সম্পত্তি কিনে দেন। (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯৬)

এরপর হযরত আবু সা'দ খায়সামা বিন আবু খায়সামার শাহাদাত এবং এর জন্য মহানবী (সা.)-এর কাছে দোয়ার আবেদনের উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে দোয়ার অনুরোধ করেন যার উল্লেখ পাওয়া যায়] মুহাম্মদ বিন উমর বর্ণনা করেন যে, খায়সামা উহুদের দিন নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি নি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যুদ্ধে বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলাম এমনকি আমি বদরের যাওয়ার জন্য লটারিও করেছিলাম কিন্তু লটারিতে আমার পুত্র সা'দ বিন খায়সামার নাম ওঠে আর সে বদরে শাহাদাত বরণ করে। বিগত রাতে স্বপ্নে আমি তাকে খুব সুন্দর অবস্থায় দেখেছি। সে জান্নাতের বাগানসমূহ এবং নহরসমূহে পায়চারি করছিল আর বলছিল যে, আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন, আমরা জান্নাতে একত্রে থাকবো, আমি আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখেছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি জান্নাতে তার সঙ্গ লাভের প্রত্যাশী। [অর্থাৎ আমি চাই যে, সেখানে গিয়ে আমি তার সাথে সাক্ষাত করি]। তিনি (রা.) বলেন, আপনি (সা.) আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে শাহাদাত এবং জান্নাতে তার সাহচার্য দান করেন। তখন মহানবী (সা.) তার জন্য দোয়া করেন। তদনুযায়ী তিনি উহুদে শাহাদাত বরণ করেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১৯) (মুসতাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৯, হাদীস-৪৯২৯)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমরের শাহাদাতের ঘটনারও এক রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) যখন উহুদের যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন নিজ পুত্র হযরত জাবেরকে ডেকে বললেন, হে আমার পুত্র! আমি নিজেকে প্রথম সারির শহীদদের মাঝে দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার পর মহানবী (সা.)-এর সত্তার পর তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ছেড়ে যাচ্ছি না যে আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। [অর্থাৎ এই দুটি সত্তা পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে প্রিয়। সর্বাগ্রে মহানবী (সা.)-এর সত্তা, এরপর হে আমার পুত্র! তুমি]। আমার কিছু ঋণ আছে। আমার পক্ষ থেকে তুমি সেই ঋণগুলো পরিশোধ করে দিবে। আমি তোমাকে তোমার বোনদের সাথে উত্তম আচরণ করার উপদেশ দিচ্ছি। [নিজ বো নদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করবে না]। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, পরবর্তী প্রভাতে আমার পিতা সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করেন আর শত্রুরা তাঁর নাক ও কান কেটে ফেলে। (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৪)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন উহুদের শহীদদের দাফন করার জন্য আসেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তাদেরকে তাদের ক্ষতসহ দাফন করে দাও কেননা আমি তাদের ওপর সাক্ষী। যে মুসলমানকেই আল্লাহ্‌র পথে আহত করা হয় সে কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে, তার রক্ত বইতে থাকবে আর তার দেহের রং হবে জাফরানের ন্যায় আর তার দেহের সুগন্ধ হবে কস্তুরির ন্যায়। [অর্থাৎ এরা হবে পছন্দনীয় মানুষ যারা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হবে, তাদেরকে গোসল দেয়া এবং কাফন ইত্যাদি পরানোর কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের পরিহিত পোষাকই তাদের কাফন। হযর ত জাবের (রা.) বলেন, আমার পিতাকে একটি চাদর কাফন হিসেবে পরিধান করানো হয়। তখন মহানবী (সা.) বলছিলেন, এদের মাঝে কে সবচেয়ে বেশি কুরআন জানে। [যখন শহীদদের দাফন করা হচ্ছিল তখন তিনি (সা.) বলছিলেন, তাদের মাঝে বেশি কুরআনের জ্ঞান রাখে?]। যখন কোনো একজনের দিকে ইশারা করা হতো যে, ইনি বেশি কুরআন জানতেন। তখন মহানবী (সা.) বলতেন, তার সাথীদের পূর্বে তাকে প্রথমে কবরে নামাও। [কুরআনের জ্ঞান যিনি বেশি রাখতেন তাকে প্রথমে দাফন করতেন।]

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) উহুদের দিন সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করেন। তাঁকে দাফন করার সময় মহানবী (সা.) বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) এবং আমর বিন জমুহ (রা.)-কে একই কবরে দাফন করো কেননা তাদের উভয়ের মাঝে নিষ্ঠা ও ভালবাসা ছিল।

মহানবী (সা.) আরো বলেন, এ জগতে যেহেতু তারা পারস্পরিক ভালবাসা রাখতো তাই তাদেরকে একই কবরে দাফন করো। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) রক্তিম বর্ণের ছিলেন এবং তাঁর মাথার সামনের অংশে চুল ছিল না এবং ততটা দীর্ঘকায় ছিলেন না কিন্তু হযরত আমর বিন জুমুহ্ ছিলেন দীর্ঘকায় ছিলেন। তাই তাই উভয়কে চেনা গেছে এবং দু'জনকে একই কবরে দাফন করা হয়েছে। (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৪)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন আমার পিতাকে নবী করীম (সা.)-এর সমীপে দেহের অঙ্গ প্রতঙ্গ কাটা অবস্থায় আনা হয়েছিল, বিশেষত কান এবং নাক। তাঁর শবদেহ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে রাখা হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি তাঁর চেহারা থেকে কাপড় উঠাচ্ছিলাম লোকেরা আমাকে তা করতে নিষেধ করে। এরপর লোকেরা এক মহিলার চিৎকারের আওয়াজ শুনল। তখন কেউ বলল, সে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমরের কন্যা। তার নাম ছিল হযরত ফাতেমা বিনতে আমর অথবা এটিও বলা হয় সে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমরের বোন ছিল। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, কেঁদো না। কেননা ফেরেশতারা স্থায়ীভাবে স্বীয় ডানা দ্বারা তাকে ছায়াবৃত করে রেখেছে।

(আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৫৪-৯৫৫) সে জান্নাতি, সৌভাগ্যবান। তাঁর জন্য কাঁদার প্রয়োজন নেই।

আরেক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আমার পিতাকে উহুদের দিন যখন নিয়ে আসা হয় তখন আমার ফুফু তাঁর জন্য কাঁদছিলেন আর আমিও কাঁদছিলাম। লোকেরা আমাকে নিষেধ করছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (রা.) আমাকে নিষেধ করেন নি। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমরা তাঁর জন্য বিলাপ কর বা না কর- তাতে কিছুই যায় আসে না। আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা তাকে দাফন করার পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত ফেরেশতারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে তার ওপর স্বীয় ডানার ছায়া বিস্তৃত করে রেখেছিল।

(আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৫৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সুরা বাকারা'র (এক) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যেসব মুসলমান শহীদ হয়েছেন তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না। তারা খোদা তা'লার জীবন্ত সৈনিক আর খোদা তা'লা নিশ্চিতভাবে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। তিনি বলেন, দেখ! একজন সাহাবীকে শহীদ করা হলো তার বিপরীতে মুশরিকদের পাঁচ ব্যক্তি নিহত হয়েছে আর প্রতিটি স্থানে এবং প্রতিটি যুদ্ধে মুসলমানের বিপরীতে কাফেররা অনেক সংখ্যায় ধ্বংস হয়েছে, কেবলমাত্র উহুদের যুদ্ধ ব্যতিরেকে যেখানে অনেক মুসলমানকে নিহত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অন্যান্য যুদ্ধে এর প্রতিশোধ নিয়েছেন।" (তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৮)

উহুদের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) সেদিন দুর্বলতার কারণে বসে নামায আদায় করেছিলেন আর সেই নামায ছিলযোহরের নামায। তাঁর (সা.) পেছনে সাহাবীরাও বসে নামায আদায় করেছিলেন। [যেহেতু তিনি (সা.) বসে নামায আদায় করেছিলেন, তাই সাহাবীরাও বসে নামায আদায় করেন, দঁাড়িয়ে পড়েন নি।] লেখক লিখেছেন, সম্ভবত এই নামায শত্রুদের চলে যাওয়ার পর আদায় করা হয়েছিল। সাহাবীদের বসে নামায আদায়ের কারণ হলো ইমাম এবং মুক্তাদির নামায আদায় যেন অভিন্ন হয়। পরবর্তীতে এ আদেশ রহিত হয় অর্থাৎ এটি আবশ্যক নয় যে, (বসে নামায আদায় করতে হবে)। মুক্তাদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে পারবে। লেখকের ধারণা হলো হতে পারে যারা বসে নামায আদায় করেছেন তারাও হয়ত আহত ছিলেন আর যেহেতু অধিকাংশ সাহাবী আহত ছিলেন যারা বসে নামায আদা য় করেছিলেন তাই এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, মুসলমানরা বসে নামায আদায় করেছেন। অর্থাৎ তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীও ছিলেন, কিন্তু শুধুমাত্র তারা যারা আহত হন নি আর এরূপ লোকের সংখ্যা অনকে কম ছিল। অধিকাংশ আহত সাহাবী ছিলেন। এ কারণে সংখ্যাগরিষ্টকেদৃষ্টিপটে রেখে বলে দেওয়া হয়েছে যে মুক্তাদিরা সবাই বসে নামায আদায় করেছেন। এটি সীরাতে হালাবিয়ার উদ্ধৃ তি। (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৪)

এখন কথা হবে উহুদের শহিদদের সংখ্যা সম্পর্কে। উহুদের শহিদের সংখ্যা সম্পর্কে অধিকাংশ আলেমদের অভিমত হলো- সেদিন মোট নিহত মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৭০। যাদের মাঝে চারজন মুহাজের ছিলেন। যাদের নাম যথাক্রমে- হযরত হামযা, হযরত মুসায়েব, হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহশ, এবং হযরত শম্মাস বিন উসমান (রা.)। একটি অভিমত অনুসারে উহুদের শহিদের সংখ্যা ছিল ৮০ জন। যাদের মাঝে ৭৪ জন ছিলেন আনসারী সাহাবি আর বাকি ৬ জন মুহাজের ছিলেন। আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী বলেন, যদি ছয়জন মুহাজের শহিদ হন তাহলে সম্ভবত পঞ্চম শহিদ হবেন হাতেব বিন বালতা'র কৃতদাস সাদএবং ষষ্ঠ সাকিব বিন আমর ছিলেন যিনি বনু আবদে শামস গোত্রের মিত্র ছিলেন। 'উয়ুন-আল-আসর' নামে একটি পুস্তক রয়েছে যাতে শহিদের মোট সংখ্যা ৯৬ জন বলা হয়েছে। মুশরিকদের মাঝে নিহতদের মোট সংখ্যা ছিল ২৩ জন। একটি অভিমত হলো- মুশরিকদের (নিহতের) সংখ্যা ২২ জন ছিল। একটি রেওয়ায়েতঅনুসারে, এই যুদ্ধে একা হযরত হামযা একত্রিশ জন মুশরিককে হত্যা করেছিলেন।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৬-৩৪৭) (উইয়ুনুল আসর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭)

যদিও এই রেওয়ায়েত সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা, তাদের নিহতদের মোট সংখ্যাই ছিল ২৩ জন। একজন জীবনীকার উহুদের শহিদদের সংখ্যা সম্পর্কে লিখেন- উহুদের যুদ্ধে কাফিরদের হাতে শাহাদাতের সম্মান লাভকারী সাহাবীদের সীংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। ঐতিহাসিক, জীবনীকার এবং হাদিস বিশারদদের মতে উহুদের শহিদদের সংখ্যা সম্পর্কে ৪৯ থেকে শুরু করে ১০৮ পর্যন্ত অভিমত পাওয়া যায়। কিন্তু অধিক প্রসিদ্ধ অভিমত হলো- উহুদের দিন সত্তর জন সাহাবি শহিদ হয়েছিলেন।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৯-৪০]

উহুদের যুদ্ধের শহিদদের জানাযা নামায এবং দাফন কাফনের উল্লেখও দেখা যায়। শহিদদের জানাযা নামায সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদের

শহিদদের দু –দু'জনকে একসাথে একই কাপড়ে আবৃত করতেন এবং এরপর জিজ্ঞেস করতেন, তাদের মাঝে কে বেশি কুরআন জানতেন। এরপর যখন তাদের মাঝে কোনো একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হতো তখন মহানবী (সা.) তাকে প্রথমে কবরে রাখতেন। একই কাপড়ে আবৃত থাকলে ডান বাম করে একজনকে প্রথমে দাফন করা হতো, এরপর অন্যজনকে। এরপর তিনি (সা.) বলতেন, আমি কিয়ামতের দিন তাদের বিষয়ে সাক্ষী থাকবো। আর তাদেরকে মহানবী (সা.) রক্তাক্ত অবস্থায় দাফন করার আদেশ দিতেন। না তাদেরকে গোসল করানো হয়েছে আর না তাদের জানাযা পড়ানো হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস–১৩৪৩)

সহীহ বুখারীর অন্য একটি রেওয়ায়েতে হযরত উকবা বিন আমের বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এক দিন আসেন এবং তিনি (সা.) একজন শহীদের জানাযা পড়েন। বুখারীর অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, তিনি (সা.) উহুদের শহিদদের জানাযা উহুদের যুদ্ধের ৮ বছর পর পড়িয়েছিলেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জানায়েজ, হাদীস–১৩৪৪) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস–৪০৪২)

এখানে বিভিন্ন বর্ণনাকারীদের বর্ণনাকৃত বিভিন্ন রেওয়ায়েত সামনে এসেছে। যা উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু মনে হয় তখন পড়া হয়নি। পরবর্তীতে কোনো এক সময় জানাযা পড়া হয়েছিল।

সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হয়েছে–হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের শহিদদের মহানবী (সা.) এর সমীপে নিয়ে আসা হতো। মহানবী (সা.) দশ জন দশ জন শহিদদের জানাযা একসাথে পড়েছেন আর হযরত হামযার লাশ মহানবী (সা.) এর সামনেই থাকতো আর বাকি শহিদদের সরিয়ে নেওয়া হতো। (সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়েজ, হাদীস–৩১৩৫)

হতে পারে এক্ষেত্রেও তারা ভুল বুঝেছে। সুনানে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে– হযরত আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধে শহিদদের গোসল দেওয়া হয়নি আর তাদেরকে তাদের রক্ত অর্থাৎ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় দাফন করা হয়েছিল। আর তাদের মাঝে কারো জানাযা নামায পড়া হয়নি।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়েজ, হাদীস–৩১৩৭)

সুনানে আবি দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে হযরত আনাস বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হামযা ব্যতীত আর কোনো শহীদের জানাযা পড়েন নি।

(সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল জানায়েজ, হাদীস–১০১৬)

সুনানে তিরমিযীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদ যুদ্ধের শহিদদের জানাযা পড়েন নি। অধিকাংশের মতামত হলো জানাযা পড়া হয় নি। সীরাতে ইবনে হিশাম ও সীরাতে হালাবিয়্যাতে লেখা আছে, মহানবী (সা.) উহুদের শহিদদের মাঝে সর্বপ্রথমে হযরত হামযার জানাযা পড়া হয়। তিনি জানাযার নামাযে সাতবার তাকবির দিয়েছেন। সীরাত হালাবিয়্যাহ অনুসারে–চারবার তাকবীর দেয়া হয়। এরপর বাকি শহিদদের একে একে নিয়ে এসে হামযা (রা.)–এর লাশের পাশে রাখা হতো এবং তিনি (সা.) উভয়ের জানাযা পড়েছেন, এভাবেই সকল শহিদদের জানাযা একবার আর হযরত হামযা (রা.)–এর জানাযা বাহাত্তর বার আর কারো কারো মতে বিরানব্বই বার পড়া হয়েছিল।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৯৫) (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৭) সবকটি রেওয়ায়েত লিখে দেওয়া হলেও এসবের মাঝে কিছু দুর্বল রেওয়ায়েতও রয়েছে।

'দালায়েলুন নবুওয়া' নামক জীবনীগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হযরত হামযা (রা.)–এর মৃতদেহের কাছে নয়জন শহিদকে একত্রে আনা হতো আর তাদের জানাযার নামায পড়া হতো। তারপর এই নয়জনকে নিয়ে যাওয়ার পর অন্য নয়জন শহিদকে নিয়ে আসা হতো আর এভাবে এই সকল শহিদের জানাযার নামায পড়া হয়। আর তিনি (সা.) প্রতিবার জানাযার নামাযে সাত তাকবীর দিয়েছিলেন।

(দালায়েলুন নবুয়্যত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৭)

সীরাত হালাবিয়্যাহ ও দালায়েলুন নবুওয়া গ্রন্থে উহুদের শহিদদের জানাযার নামায সংক্রান্ত হাদিস সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এবং এ দুটি গ্রন্থে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) রেওয়ায়েত হলো, মহানবী (সা.) ওহুদের যুদ্ধের শহিদদেরকে তাদের রক্তমাখা দেহেই দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের গোসলও করানো হয় নি বা তাদের জানাযা নামাযও পড়া হয় নি। এই বর্ণনাকে বেশি নীর্ভরযোগ্যা আখ্যা দেওয়া হয়।

(দালায়েলুন নবুয়্যত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৭) (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৮)

তাই চূড়ান্ত কথা হলো জানাযা নামায পড়া হয়নি।

হযরত ইমাম শাফী (রহ.) বর্ণনা করেন, নিরবচ্ছিন্ন রেওয়ায়েত থেকে এটি দৃঢ়ভাবে প্রতিয়মান হয় যে, মহানবী (সা.) উহুদের শহিদদের জানাযা পড়েন নি। আর যে সব রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) শহিদদের জানাযা পড়েছেন এবং হযরত হামযা (রা.)র জানাযা সত্তরবার পড়েছেন– সেগুলো সঠিক নয়। হযরত উকবা বিন আমর (রা.)–এর রেওয়ায়েত হলো 'মহানবী (সা.) ৮ বছর পর শহিদদের জানাযা পড়েছেন' – এতে উল্লেখ রয়েছে যে, এটি আট বছর পরের ঘটনা; তখনকার ঘটনা নয়।

ইমাম বুখারী তাঁর গ্রন্থে বাবুস্ সালওয়াতু আলাশ্ শহিদ, অর্থাৎ শহিদদের জানাযার নামাযের বিষয়ে একটি অধ্যায় সংকলন করেছেন। আর এ বিষয়ে মাত্র দুটি হাদীস সংকলন করেছেন। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত প্রথম হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– উহুদের যুদ্ধে শহিদদের গোসল করানো হয় নি এবং তাদের জানাযার নামাযও পড়া হয়নি, অপরদিকে দ্বিতীয় হাদিসে হযরত উকবা বিন আমের (রা.) বর্ণনা করেন, أَنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ অর্থাৎ একদিন মহানবী (সা.) বের হয়ে উহুদের শহিদদের জানাযার নামায পড়ানোর আদলে নামায পড়ান এবং বুখারীতেও এ হাদীসটিই উহুদের যুদ্ধের অধ্যায়েও এটি অন্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে একই সাহাবি বর্ণনা করেছেন এবং বলেন, صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ অর্থাৎ, আল্লাহর রসূল (সা.) উহুদের শহিদদের জন্য আট বছর পর সেভাবেই জানাযা পড়েছিলেন যেভাবে জীবিত বা মৃতদের বিদায় জানানো হয়।

অনুরূপভাবে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, ইমাম শাফী (রহ.)–এর এই কথার অর্থ হলো, কারো মৃত্যুর পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তার কবরে জানাযা পড়া হয় না। ইমাম শাফী (রহ.)–এর মতে, মহানবী (সা.) যখন বুঝতে পারলেন যে তাঁর বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তখন তিনি সেই শহিদদের কবরের কাছে গিয়ে তাদেরকে বিদায় জানান আর তাদের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

(ফতহুল বারি শারাহ বুখারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৮–২৪৯) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস–৪০৪২)

জামাতের অবস্থানও সেটিই যা হযরত মির্যা বশির আহমদ (রা.) সাহেব লিখেছেন । এটি স্পষ্ট কথা যে তখন জানাযার নামায পড়া হয় নি। অর্থাৎ এমনসব রেওয়ায়েত রয়েছে যেগুলো অনুসারে শহিদদের জানাযা পড়া হয়নি। তিনি (রা.)ও এটিই লিখেছেন যে– জানাজা নামায আদায় করা হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন মহানবী (সা.) এর মৃত্যু সময় ঘনিয়ে আসলো তখন মহানবী (সা.) বিশেষভাবে উহুদের শহিদদের নামাযে জানাজা আদায় করেছেন। আর অত্যন্ত বিগলিত চিত্তে তাদের জন্য দোয়া করেছেন। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা–হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৫০২) এ ধরনের আরো কিছু বর্ননা আছে। বাকী পরবর্তীতে বর্ননা করা হবে ইনশাল্লাহ।

পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কিছু বলতে চাই। যুদ্ধের আগুন এখন ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে।

মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য এখন অনেক দোয়ার প্রয়োজন। এখন যদি আহমদীরা দেয়া করে তাহলে কিছু হতে পারের।

ইসরাঈল সরকার তাদের হঠকারিতায় অনঢ়। প্রত্যেক কথায় তারা কোনো না কোনো অজুহাত খুজে বলে দিচ্ছে যে, আমরা এই কারণে এটি করেছি আর কোনো কথা বা যুক্তির কথা তারা মানতে চায় না। পৃথিবীর অন্যান্য শক্তিশালী দেশ, তারাও যাচ্ছেতাই করছে বা তারাও ইসরাঈলকে ভয় পায়। এরা প্রথমে বলে যুদ্ধ বন্ধ করা উচিত, নির্যাতন বন্ধ করা উচিত। কিন্তু যখন ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী বা তার সরকার কোন বিবৃতি দেয় তারাও সুর মিলায়। আল্লাহ তা'লা মুসলমানদের প্রতিও দয়া করুন, আর তাদেরকে খোদাতা'লার দিকে বিনত করুন। এটিই একমাত্র উপায় যা অনুসরণ করলে এই লোকেরা তাদের দুনিয়া ও আখিরাতকে সুন্দর করতে পারে।

আল্লাহতা'লা তাদের প্রতি করুণা করুন আর আমাদেরকেও দোয়া করার তৌফিক দান করুন আর আমাদের প্রতিও দয়া করুন। (আমীন)

****

১ম পাতার পর.....

অজুহাত দাঁড় করিয়ে নেয় এবং এর সঙ্গে কৃত্রিমতা যুক্ত করে সেই অজুহাতকে সঠিক বলে মনে করে। কিন্তু তা খোদার নিকট সঠিক নয়। ভণিতার অধ্যায় সুবিশাল। মানুষ চাইলে এই(ভনিত) দৃষ্টিকোণ থেকে আজীবন বসে নামায পড়তে পারে আর সে রমযানের রোযা মোটেই রাখবে না। কিন্তু যার মধ্যে সততা ও নিষ্ঠা রয়েছে তার সংকল্প ও সদিচ্ছা সম্পর্কে অবগত আছেন। খোদা তা'লা জানেন যে তার হৃদয়ে ব্যকুলতা আছে আর খোদা তা'লা তাকে প্রতিদানের থেকেও বেশি দিয়ে থাকেন। কেননা হৃদয়ের ব্যকুলতা এক ঈর্ষনীয় বস্তু। অজুহাত সন্ধানী মানুষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু খোদা তা'লার নিকট এই নির্ভরশীলতা কোন মূল্য রাখে না। আমি যখন ছয়মাস রোযা রেখেছিলাম, তখন একবার আম্বিয়াগণের দল আমার সঙ্গে (কাশফে) সাক্ষাত করেন। তারা আমাকে বলেন, তুমি কেন নিজেকে এত কষ্টে নিপতিত করেছ? এর থেকে বের হও। অনুরূপভাবে মানুষ যখন নিজেকে খোদার কারণে কষ্টে নিপতিত করে, তখন তিনি স্বয়ং পিতা-মাতার ন্যায় মমতাশীল হয়ে বলেন, তুমি কেন নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলে রেখেছ?

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৬৩)

জুমআর খুতবা

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর বায়ান্ন বছরের খিলাফতের প্রতিটি দিন এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে।

যেখানেই মুসলমান জাতির উন্নতি ও কল্যাণের প্রশ্ন আসতো তাঁর অনুসরণীয় পরামর্শ আমাদের মনোবল বৃদ্ধির কারণ হতো। এমন অবস্থায় জাতির বেদনায় তাঁর দেহের রন্ধ্র রন্ধ্র বেদনায় বিহ্বল হয়ে যেতো। ফির্কাবাজীর লেশমাত্র আমি তাঁর সত্তায় দেখিনি। মির্যা সাহেব (রা.) প্রখর বুদ্ধিমান ছিলেন। ....আমরা চোখে মুখে নৈরাশ্য ও হতাশার ছাপ নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যেতাম আর যখন বের হতাম তখন মনে হতো, হতাশার ঘন মেঘ কেটে গেছে এবং অচিরেই লক্ষ্য অর্জি ত হতে যাচ্ছে। তিনি অকাট্য যুক্তি দিতেন এবং অনুসরণযোগ্য বা বাস্তবায়নযোগ্য কথা বলতেন। আর কেবল এতেই ক্ষান্ত হতেন না বরং এর সাথে সকল প্রকার ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সহযোগিতার প্রস্তাবও দিতেন। যা আমাদের সাহস ও মনোবল জোগাতো।

(মৌলানা গোলাম রসুল মেহের, সম্পাদক- ইনকিলাব পত্রিকা)

আমি আজ পর্যন্ত এমন যৌক্তিক কথা এবং এত প্রমাণ সমৃদ্ধ বক্তব্য কোনো মুসলমানের মুখে শুনতে পাইনি। মনে হয় তোমাদের খলীফা অনেক বড় একজন পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। বিশ্বের ধর্মাবলীর তিনি সুগভীর জ্ঞান রাখেন। (আমেরিকান পাদ্রী)

রাজনীতির মাঠে নিজ জামাতকে সাধারণ মুসলমানদের সমান্তরালে চালানোর ক্ষেত্রে যে কর্মপদ্ধতির সূচনা করে সেটাকে নিজ নেতৃত্বে সফল করেছেন, তাও প্রত্যেক ন্যায়পরায়ন মুসলমান ও সত্যসচেতন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রশংসা কুড়িয়ে থাকে। (সিয়াসত পত্রিকা, লাহোর)

"সেই সময়টি দূরে নয় যখন এই সুসংগঠিত ফির্কার কর্মপদ্ধতি সার্বিকভাবে সব মুসলমানের জন্য আর বিশেষভাবে সে সকল ব্যক্তিদের জন্য আলোকবর্তিকা প্রমাণিত হবে যারা বিসমিল্লাহ্‌র গম্বুজে বসে ইসলামের সেবার বড় বড় অথচ অন্তঃসারশূন্য আস্ফালনে রত।" (মৌলানা মহম্মদ আলি জওহর)

"আমার দৃষ্টিতে মির্যা সাহেবের পৃথক হয়ে যাওয়া প্রকারান্তরে কমিটির মৃত্যুর নামান্তর। সার কথা হলো, আমাদের নির্বাচন কতটা সঠিক তা এখন পৃথিবীর স্পষ্ট হয়ে যাবে।" (সৈয়্যদ হাবীব সাহেব)

He has a good mind and had carefully thoughtout his constitutional scheme (Edwin Samuel Montagu, Secretary of State for India)

মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কতিপয় দিক পূর্ণ হওয়ার বিষয়ে সত্যসচেতন ব্যক্তিদের অভিমত।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (২৩ তবলীগ, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ আমি মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু দিক উল্লেখ করব। যেভাবে প্রত্যেক আহমদী অবগত আছেন এবং প্রতি বছর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা উপলক্ষ্যে জলসারও আয়োজন করা হয়ে থাকে । এটি ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সালের ভবিষ্যদ্বাণী, যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বিভিন্ন গুণাবলীর অধিকারী এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বর্ণনা করার পূর্বে আমি শিশু কিশোর এবং কতক যুবকের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই, ইতিপূর্বেও কয়েকবার দিয়েছি; যারা বলে যে, আমরা যেহেতু জন্মবার্ষিকী পালন করি না তাই হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র জন্মদিন কেন পালন করা হয়?

এ সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যেমনটি আমি পূর্বেও অনেকবার (এ কথা) বলেছি, (এদিনে) মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের জন্মদিন পালন করা হয় না, বরং ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা উপলক্ষ্যে জলসার আয়োজন করা হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র জন্ম হয়েছিল, ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী । দ্বিতীয়ত, যেসব পরিবারে এ বিষয়ে আলোচনা হয় না সেখানে পিতামাতাদের স্বয়ং (এ সম্পর্কে) পড়াশোনা করে সন্তানদের জানানো উচিত বরং বুঝানোও উচিত যে, মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি (আসলে) কী? এটি এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলী অনুযায়ী (বা) অতীতের নবীরাও (যার) সংবাদ দিয়েছেন এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এ ঘোষণা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এটি এক দীর্ঘ ভবিষ্যদ্বাণী যার প্রথমাংশ আমি পাঠ করছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "পরম দয়ালু ও করুণাময়, সুমহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশক্তিমান খোদা (যিনি মহা মর্যাদাবান ও গৌরবময় নামের অধিকারী), আমাকে সম্বোধন করে নিজ এলহামে সংবাদ প্রদানপূর্বক বলেছেন, আমার সমীপে তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী তোমাকে আমি দয়ার একটি নিদর্শন দিচ্ছি। আমি তোমার আকুতিমিনতি শুনেছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে নিজ কৃপাগুণে গ্রহণ করেছি আর তোমার (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানার) সফরকে তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি। অতএব শক্তি, দয়া এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেয়া হচ্ছে। কৃপা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে প্রদান করা হচ্ছে। বিজয় ও সাফল্যের চাবি তুমি পেতে যাচ্ছ। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম। খোদা একথা বলেছেন, যেন জীবন প্রত্যাশীরা মৃত্যুর কবল হতে মুক্তি লাভ করে। যারা কবরে চাপা পড়ে আছে তারা বেরিয়ে আসে, যেন ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্‌র বাণীর মর্যাদা মানবজাতির সামনে প্রকাশিত হয়, সত্য স্বীয় কল্যাণরাজিসহ এসে উপস্থিত হয়, মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণ সহ পলায়ন করে এবং মানুষ যেন বুঝতে পারে, আমিই সর্বশক্তিমান, যা চাই তা-ই করে থাকি। অধিকন্তু তারা যেন নিশ্চিতভাবে জেনে নেয়, আমি তোমার সঙ্গে আছি। যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী আর খোদা, তাঁর ধর্ম এবং তাঁর কিতাব ও পবিত্র রসুল মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে অস্বীকার করে এবং অসত্য বলে মনে করে তারা যেন একটি স্পষ্ট নিদর্শন লাভ করে আর অপরাধীদের পথ চিহ্নিত হয়ে যায়। অতএব তোমার জন্য সুসংবাদ! এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি এক মেধাবী পুত্র লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত এবং তোমার বংশ হবে।" অতঃপর ভবিষ্যদ্বাণীর পরের অংশে এ সন্তানের বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যার মাঝে দু'একটির আমি উল্লেখ করছি। (আল্লাহ্) বলেছেন, "সে অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান হবে আর বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে সমৃদ্ধ করা হবে।" এরপর বলেন, "সে বন্দিদের মুক্তির কারণ হবে।"

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬৪৭)

এ হলো সেই দীর্ঘ ভবিষ্যদ্বাণীর কয়েকটি বাক্য। পরবর্তীতে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, আল্লাহ তা'লার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে তিনি যে সংবাদ দিয়েছিলেন, সে অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই পুত্রের জন্ম হয়। (তিনি) ভবিষ্যদ্বাণীর সবকটি অংশের সত্যায়নকারী ও সত্যায়নস্থল প্রমাণিত হন, যার সংখ্যা পঞ্চাশ বা বায়ান্ন। যাহোক, যেমনটি আমি বলেছি, ভবিষ্যদ্বাণীর দু-তিনটি বাক্যই আমি (খুতবার জন্য) নির্বাচন করেছি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র বায়ান্ন বছর বিস্তৃত খিলাফতকালের প্রতিটি দিন এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার প্রমাণ বহন করছে। অস্বীকারকারী কোনো বিরোধী (হয়ত) আমাদের বলতে পারে যে, আহমদীরা তো এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার যুক্তি দিবেই এবং বলবে যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু (তোমরা) কোনো অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করো। এসব হলো, আপত্তিকারীদের গোঁয়ার্তুমি; নতুবা যেমনটি আমি বলেছি, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র যুগের প্রতিটি দিন, জামা'তে আহমদীয়ার উন্নতির এক সমুজ্জ্বল প্রমাণ। যাহোক, ভবিষ্যদ্বাণীর যেসব দিক আমি উল্লেখ করেছি, সে সম্পর্কে এমন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্য উপস্থাপন করছি যাদের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু তারা উপমহাদেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব।

যেমন, মওলানা গোলাম রসূল মেহের সাহেব একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৮৮৫ সনে জলন্ধরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন গবেষক, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ইতিহাসবীদ ছিলেন। 'দৈনিক জমিদার' পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে মওলানা আব্দুল মজীদ সালেক সাহেবের সাথে যৌথভাবে লাহোর হতে 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৬৬ সনের ২০ এবং ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে লাহোরের শেখ আব্দুল মাজেদ সাহেব, মওলানা (গোলাম রসূল) সাহেবের কাছে আসেন। কথোপকথনের এক পর্যায়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সম্পর্কে মওলানা গোলাম রসূল মেহের সাহেব বলেন, "আপনাদের কোনো পুস্তকে এই মহান ব্যক্তির মহান কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গীণভাবে জানা যায় না। আমরা তাঁকে খুবই কাছে থেকে দেখেছি। অনেকবার সাক্ষাৎও করেছি। একান্তে মতবিনিময় করেছি। মুসলমান জাতির জন্য তাঁর সত্তা ত্যাগের মূর্ত প্রতীক ছিল।" পুনরায় তিনি বলেন, একবার রাতা রাতি আমাকে কাদিয়ান গিয়ে হযরত সাহেবের সাথে পরামর্শ করতে হয়েছিল। সেই সফর (যেন) আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। মানবতার জন্য সেই ব্যক্তি অর্থাৎ মুসলেহে মওউদের হৃদয়ে গভীর বেদনা ছিল। যেখানেই মুসলমান জাতির উন্নতি ও কল্যাণের প্রশ্ন আসতো তাঁর অনুসরণীয় পরামর্শ আমাদের মনোবল বৃদ্ধির কারণ হতো। এমন অবস্থায় জাতির বেদনায় তাঁর দেহের রন্ধ্র রন্ধ্র বেদনায় বিহ্বল হয়ে যেতো। ফির্কাবাজীর লেশমাত্র আমি তাঁর সত্তায় দেখিনি। মির্যা সাহেব (রা.) প্রখর বুদ্ধিমান ছিলেন।

ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্য ছিল, "সে অত্যন্ত ধীমান ও প্রজ্ঞাবান হবে।" অ-আহমদীরাও এর সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এরপর আলাপচারিতার ধারা বজায় রেখে (তিনি) বলেন, আমি পাক-ভারতে এমন কোনো রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা দেখিনি যার মস্তিষ্ক ব্যবহারিক রাজনীতিতে এমনভাবে কাজ করে যেমনটি মির্যা সাহেবের মস্তিষ্ক কাজ করতো। নিঃস্বার্থ পরামর্শ, সুস্পষ্ট প্রস্তাবলী এবং সঠিক কর্মপন্থা এবং কর্মের সঠিক রূপরেখা প্রদান ছিল তাঁর (অনন্য) বৈশিষ্ট্য। তাঁর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তিনি বলেন, আমি ইসমাঈল পানিপতী সাহেবকে সমবেদনাপত্র প্রেরণ করেছি। সেই পত্রে একথাও লিখে দিয়েছি যে, তিনি চাইলে হযরত সাহেব সংক্রান্ত সমবেদনামূলক বাক্যাবলী ছাপিয়েও দিতে পারেন।

পরিতাপের (বিষয় হলো)! মুসলমানেরা মির্যা সাহেবের মূল্যায়ন করেনি। বিরোধিতার প্রবল তুফান সত্ত্বেও আমি মির্যা সাহেবকে কখনো বিষন্ন এবং (মুসিলিম স্বার্থের বিষয়ে) ভ্রুক্ষেপহীন দেখিনি। মির্যা সাহেবের হৃদয়-প্রদীপ সদাই প্রজ্জ্বলিত ছিলো।

আমরা চোখে মুখে নৈরাশ্য ও হতাশার ছাপ নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যেতাম আর যখন বের হতাম তখন মনে হতো, হতাশার ঘন মেঘ কেটে গেছে এবং অচিরেই লক্ষ্য অর্জি ত হতে যাচ্ছে। তিনি অকাট্য যুক্তি দিতেন এবং অনুসরণযোগ্য বা বাস্তবায়নযোগ্য কথা বলতেন। আর কেবল এতেই ক্ষান্ত হতেন না বরং এর সাথে সকল প্রকার ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সহযোগিতার প্রস্তাবও দিতেন। যা আমাদের সাহস ও মনোবল জোগাতো। (মাসিক খালিদ পত্রিকা, সৈয়্যদানা মুসলেহ মওউদ নম্বর, জুন-জুলাই, ২০০৮, পৃ: ৩২৫-৩২৬)

তাঁর বিষয়ে কাশ্মীরের সাবেক প্রধান জজ, জনাব লালা কৃমর সেন সাহেব, একটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। লালা কৃমর সেন সাহেব লালা ভিম সেন সাহেবের সন্তান ছিলেন। তিনি হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রা.)-এর বক্তৃতা 'বিশ্বের অন্যান্য ভাষার মাঝে আরবী ভাষার মর্যাদা' সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় একটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর বিশেষভাবে সকৃতজ্ঞ অবেগে বলেন, আজ যোগ্য বক্তা আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যে চিত্তাকর্ষক ও চমৎকার বক্তৃতা করেছেন তা শুনে আমি যারপরনায় আনন্দিত। আর একারণেও আমি আনন্দিত যে, ব্যাক্তিগতভাবে তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক আছে। কেননা তাঁর পিতার কাছ থেকে আমার পিতা আরবী শিখেছিলেন। লালা সাহেবের পিতা হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) -এর কাছে আরবী শিখেছিলেন। তিনি বলেন: আমি যখন বক্তৃতা শুনতে আসি তখন আমার ধারণা ছিল বিষয় সেভাবে উপস্থাপন করা হবে যেভাবে পুরনো ধাঁচের লোকেরা বর্ণনা করে থাকে। প্রসিদ্ধ আছে যে, একবার কোনো আরবের কাছে আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, এই শ্রেষ্ঠত্বের তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলো আমি আরবের বাসিন্দা। তার মতে এটি হচ্ছে আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব । দ্বিতীয়ত এটি পবিত্র কুরআনের ভাষা। ঠিক আছে, এটি যুক্তিযুক্ত কথা। তৃতীয় কারণ হলো জান্নাতেও আরবী ভাষায় কথা বলা হবে। তিনি বলেন, আমি ভেবেছিলাম হয়ত আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে এ ধরনেরই কথা বার্তা উপস্থাপন করা হবে। কিন্তু যে বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে তা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও দর্শনসমৃদ্ধ। আমি জনাব মির্যা সাহেবকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমি তাঁর বক্তব্যের এক একটি শব্দ পূর্ণ মনোযোগ এবং গভীর অভিনিবেশসহ শ্রবণ করেছি আর আমি এটি খুবই উপভোগ করেছি ওউপকৃত হয়েছি। আমি আশা করি এই বক্তব্যের প্রভাব দীর্ঘ দিন আমার মনমস্তিকে বিরাজ করবে।

(তারিখে আহমদীয়াত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৮১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাথমিকেও উত্তীর্ণ হননি। এই জ্ঞানে আল্লাহতা'লাই তাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; আর অ-আহমদীরাও এর প্রশংসা না করে পারেনি।

একজন আমেরিকান পাদ্রীর অভিব্যক্তি শুনুন। শের ইসমাইল সাহেব পানিপতি বর্ণনা করেন যে, শিমলার মৌলবী উমর উদ্দীন সাহেব একবার একটি ঘটনা শোনান। তিনি বলেন, হুযূরের খলিফা নির্বাচিত হওয়ার কয়েক মাস পরে, অর্থাৎ হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রা.) খেলাফতে সমাসীন হন ১৯১৪ সালে। এর কয়েক মাস পরে আমেরিকার একজন বড় পাদরি কাদিয়ান আসেন। যিনি একজন অনেক বড় আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং নিজের জ্ঞান নিয়ে গর্বও করতেন। কাদিয়ানে পোঁছে তিনি আমাদের সামনে ধর্ম সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যেগুলো খুবই বস্তুনিষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একই সাথে তিনি বলেন, আমি আমেরিকা থেকে এখানে এসেছি এবং আমি মুসলমানদের প্রতিটি সভায় এই প্রশ্নগুলো তুলেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত মুসলমানদের কোনো বড় থেকে বড় আলেম ও পণ্ডিত এই প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি। আমি এখানে বিশেষভাবে আপনাদের খলিফার সামনে এই প্রশ্নগুলো উত্থাপনের জন্য এসেছি। দেখি খলিফা সাহেব এ প্রশ্নেগুলোর কি উত্তর প্রদান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই প্রশ্নগুলো এত জটিল এবং অদ্ভুত ধরনের ছিল যে, সেগুলো শুনে আমি নিশ্চিত ছিলাম হযরত সাহেবে একজন যুবক মাত্র, যিনি ধর্মসংক্রান্ত কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি। বয়সও কম আর অভিজ্ঞতাও খুবই সীমিত। তিনি এ সকল প্রশ্নের উত্তর মোটেই দিতে পারবেন না আর এভাবে সারা পৃথিবীতে আহমদীয়া জামা'তের অসম্মান হবে আর দুর্নাম ছড়িয়ে পড়বে। কেননা হযরত সাহেব এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে না পারলে এই আমেরিকান পাদরি ফিরে গিয়ে সারা পৃথিবীতে এই অপপ্রচার করবে যে, আহমদীদের খলীফা কিছুই জানে না। খ্রিষ্টধর্মের মোকাবিলায় মোটেই দাঁড়াতে পারে না। তিনি শুধু নামসর্বস্ব খলীফা, জ্ঞান বলতে কিছুই নেই । এমন পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়ে আমি খুবই চিন্তিত হই। আর আমি চেষ্টা করি যেন সেই আমেরিকান পাদরি হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ না করে ফিরে যায়। কিন্তু আমি এই চেষ্টায় সফল হইনি। সেই আমেরিকান এই কথায় অটল থাকে যে, আমি অবশ্যই খলীফা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে যাব। নিরুপায় হয়ে আমি যাই এবং আমি হুযূরের সমীপে বলি যে, একজন আমেরিকান পাদরি এসেছে আপনার কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়। এখন কী করব? হুযূর (রা.) তাৎক্ষণিকভাবে নির্দ্বিধায় বললেন, তাকে ডেকে নাও। উপায়ান্তর না দেখে আমি তাকে ডেকে আনি। হুযূরের সমীপে উপস্থিত হই। তিনি বলেন, তাদের উভয়ের মাঝে অনুবাদক আমিই ছিলাম। সেই ব্যক্তি ইংরেজিতে কথা বলছিল আর তিনি (রা.) উর্দূতে উত্তর প্রদান করছিলেন। তিনি বলেন, আমেরিকান পাদরি কিছু প্রথাগত আলোচনার পর নিজের প্রশ্নগুলো হুযূরের সমীপে উপস্থাপন করেন, যেগুলোর অনুবাদ আমি হুযূরকে শুনিয়ে দিই। হুযূর একান্ত প্রশান্তচিত্তে

সেই সমস্ত প্রশ্ন শুনেন। এরপর সেগুলোর এত সন্তোষজনক চটপট উত্তর প্রদান করেন যে, আমি শুনে হতভম্ব হয়ে যাই। আমার মোটেই বিশ্বাস ছিল না যে , হুযূর (রা.) এই প্রশ্নগুলোর এমন তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ ও অনন্য উত্তর দিতে সক্ষম হবেন। আমি যখন এসব উত্তর ইংরেজিতে আমেরিকান পাদরিকে শুনাই তখন সে-ও আশ্চর্য হয়ে যায় আর বলে যে, আমি আজ পর্যন্ত এমন যৌক্তিক কথা এবং এত প্রমাণ সমৃদ্ধ বক্তব্য কোনো মুসলমানের মুখে শুনতে পাইনি। মনে হয় তোমাদের খলীফা অনেক বড় একজন পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। বিশ্বের ধর্মাবলীর তিনি সুগভীর জ্ঞান রাখেন। এই বলে সে গভীর ভক্তির সাথে হুযূরের হাতে চুমু দেয় এবং বিদায় নেয়।

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬৩-১৬৪)

এটি হলো ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লাভের মহিমা। একজন পাদ্রি যে নিজেকে পণ্ডিত জ্ঞান করতো সেও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর একটি পুস্তিকা হলো 'নেহরু রিপোর্ট এবং মুসলমানদের স্বার্থ '। এটি সম্পর্কে এক ব্যক্তি লিখেছেন যে, হুযূরের এই সময়োপযোগী দিকনির্দেশনার কল্যাণে মুসলমানদের উচ্চ শ্রেণির লোকেরা অনেক কৃতজ্ঞ হয়েছে এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। বড় বড় ধর্মীয় নেতারা প্রশংসাসূচক ভাষায় সাধুবাদ জানিয়েছে এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন যে, আহমদীয়া জামা'তের শ্রদ্ধেয় ইমাম একান্ত প্রয়োজনের সময় মুসলমানদের সাহায্য করেছেন। অনেকেই হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেবকে বলে যে, আসল এবং উপযোগী কাজ তো আপনাদের জামা'তই করছে। আপনাদের জামা'তে যে শৃঙ্খলা রয়েছে তা অন্য কোথাও দেখা যায় না। কোলকাতার নিষ্ঠাবান আহমদী জনাব দৌলত আহমদ খান সাহেব বি.এ.এল.এল.বি সুলতান প্রত্রিকার সহ-সম্পাদক উক্ত রিভিউকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে এবং ছোট্ট অথচ সুন্দর একটি পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশ করেছেন। বাংলা ভাষাভাষীদের মাঝে এটি খুবই সমাদৃত হয়েছে। একজন সম্মানিত শিক্ষিত অ-আহমদী নেহরু রিপোর্ট -এর রিভিউ পাঠ করে এতটা প্রভাবিত হন যে, তিনি ইসলামের উন্নয়ন বিষয়ক সেক্রেটারীর নামে একটি পত্রে লিখেন, আমার একান্ত বাসনা হলো হযরত খলীফা সাহেবকে দেখি এবং তার দর্শন লাভ করি। কেননা আমার হৃদয়ে তাঁর প্রতি অনেক সম্মান রয়েছে। আপনি অনুগ্রহ করে হযরত সাহেবের সমীপে এই অধমের সালাম নিবেদন করবেন এবং এটিও বলবেন যে, এক সেবকের পক্ষ থেকে মোবারকবাদ গ্রহণ করুন, কেননা যে বিপদসংকুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ইসলাম এখন অতিবাহিত হচ্ছে আপনি একান্ত উত্তমরূপে তার থেকে সেটিকে রক্ষা করছেন। আর শুধুমাত্র ধর্মীয় দিক থেকেই তত্ত্বাবধান করছেন না বরং রাজনৈতিক বিষয়াদিতেও মুসলমানদের পথ নির্দেশনা প্রদান করছেন। আমি নেহরু রিপোর্ট সম্পর্কে আপনার চিন্তাধারা সম্পর্কে পড়েছি। এটি আমার দৃষ্টিতে আপনার মর্যাদাকে আরো বৃদ্ধি করেছে। আমি যেখানে আপনাকে অনেক বড় ধর্মীয় আলেম মনে করি, সেখানে একজন দক্ষ রাজনীতিবিদও মনে করি।" (তারিখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৭১-৭২)

'সিয়াসত' পত্রিকা লাহোর থেকে প্রকাশিত হতো। ১৯৩০ইং এর ০২ডিসেম্বর এটি লিখেছে যে, ধর্মীয় মতপার্থক্যকে একপাশে রেখে দেখলে বোঝা যায় যে জনাব বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব প্রকাশনা জগতে যে অবদান রেখে গেছেন তা বিশালতা ও উপকারিতার দিক থেকে সকল প্রকার প্রশংসার যোগ্য। রাজনীতির মাঠে নিজ জামাতকে সাধারণ মুসলমানদের সমান্তরালে চালানোর ক্ষেত্রে যে কর্মপদ্ধতির সূচনা করে সেটাকে নিজ নেতৃত্বে সফল করেছেন, তাও প্রত্যেক ন্যায়পরায়ন মুসলমান ও সত্যসচেতন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রশংসা কুড়িয়ে থাকে।

এক বিশাল জনগোষ্ঠী তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অনুরাগী। নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে একত্রিত করা, সাইমন কমিশনের সামনে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা, সমসাময়িক বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিসমৃদ্ধ বিতর্ক এবং মুসলমানদের অধিকার আদায়ের অনুকূলে যুক্তিপ্রমাণ সমৃদ্ধ পুস্তকাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। বর্তমানে আলোচ্য পুস্তক সাইমন কমিশন রিপোর্টের ব্যাপারে তাঁর পর্যালোচনা যা ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়েছে, এটি পাঠে তাঁর জ্ঞানের ব্যপকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ হয়। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি সাবলীল যা মানুষকে মানতে বাধ্য করে। তাঁর ভাষা খুবই মার্জিত ও পরিশিলিত। " (তারিখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৯)

ইরাকের অবস্থার প্রেক্ষিতে অল ইন্ডিয়া রেডিও লাহোরে তিনি (রা.) বক্তৃতা করেছিলেন। এই বিষয়েও অভিমত রয়েছে। ইরাকের পরিস্থিতির সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একটি বক্তৃতা করেছিলেন যা অল ইন্ডিয়া রেডিও স্টেশন লাহোর থেকে ২৫ মে ১৯৪১ইং প্রচারিত হয়। এই বক্তৃতার কারণ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী ও ইতালির ইরাকের ওপর আক্রমণ । দিল্লির প্রসিদ্ধ শিখ পত্রিকা 'রিয়াসত' ২ জুন ১৯৪১ইং এ সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত মন্তব্য প্রকাশ করেছে।

বলা হয়ে থাকে পরাধীন জাতি ও পরাধীন দেশের চরিত্রের সবচেয়ে দুর্বল দিক হলো, সেসব জাতির লোকেরা নৈতিক সততা ও সাহস হারিয়ে বসে। চাটুকারিতা, মিথ্যা, তোষামোদ এবং ভীরুতার অভ্যাস তাদের মাঝে প্রকট হয়ে উঠে। ইরাকের রশীদ আলীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছে, ইরাকের রশীদ আলী বৃটিশ সরকার অথবা বৃটিশ প্রজাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভ্রান্তিতে থাকলেও অথবা বৃটিশদের সাথে তার যুদ্ধ করা অযৌক্তিক হলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই ব্যক্তি নিজ দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। তাকে কোনভাবেই নিজ দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক অথবা ট্রেইটর বলা যায় না। কিন্তু আমাদের পরাধীন দেশের শাসক এবং নেতাদের চরিত্র দেখুন, যারা ইরাকের নেতার ব্যাপারে বক্তৃতা করে সে রশীদ আলীকে বিশ্বাসঘাতক বলে চিৎকার করছে। যে নেতা যুদ্ধের ব্যাপারে বিবৃতি দেয়, সর্বপ্রথম সে রশীদ আলীকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেয় এরপর নিজ কথার সূচনা করে। এসব শাসক ও নেতাদের চরিত্র অর্থাৎ এসব মুসলমান এবং হিন্দুস্তানের কতিপয় অন্যান্য নেতার চরিত্র দাসত্বের কারণে এতটাই হীন যে এরা অন্যায় তোষামোদও চাটুকারিতাকেই দেশ অথবা সরকারের সেবা মনে করে। আমাদের শাসক ও নেতাদের এমন অজ্ঞোচিত তোষামোদের বিপরীতে কাদিয়ানের আহমদী জামাতের নেতার নৈতিক সাহস তাঁর উন্নত চরিত্র এবং তাঁর সুস্পষ্ট বক্তৃতা, সাগ্রহে ও সানন্দ্যে অনুভব করা হবে, যার প্রকাশ তিনি পূর্বের সপ্তাহে রেডিওতে নিজ ভাষণে করেছেন।" (তারিখে আহমদীয়াত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৩৯-২৪৪) এটি জাতিকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার তাঁর প্রচেষ্টা ছিল।

মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহার সাহেব ১৮৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি রামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কমরেড' প্রকাশ করেন। তিনি দিল্লী থেকে 'হামদার্দ' নামেও একটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৩ সালে 'অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস'-এর সভাপতি নির্বাচিত হন, 'গোলটেবিল বৈঠক'-এ অংশগ্রহণের জন্য লন্ডনে যান; আর সেখানেই তিনি ১৯৩১ সালের ৪ জানুয়ারী মৃত্যুবরণ করেন।

(মৌলানা মহম্মদ আলি জওহর (হায়াত ও খিদমাত), প্রণেতা- ডক্টর নাদীম শফীক মালিক, পৃ: ১৫,৩০,৪১,৪৫,৪৮)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, এর দৃঢ়তা ও বিনির্মাণ এবং এর উন্নতির প্রতিটি পর্যায়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর অবদান ছিল অতুলনীয়। আজ এরা বলে যে, আহ্মদীরা কী করেছে? এ তো স্বয়ং অ-আহমদী স্বীকার করছেন যে, উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে আহমদীরা। মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহার সাহেব এ বিষয়ে তার অভিব্যক্তি ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ সালে তার পত্রিকা 'হামদার্দ'-এ লিখেন। তিনি লিখেন, এটি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের নামান্তর হবে যদি এ স্থলে জনাব মির্যা বশিরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ ও তাঁর এই সুশৃঙ্খল জামাতের উল্লেখ না করি, যারা ধর্মীয় মতপার্থক্যের উর্ধ্বে থেকে তাদের পূর্ণ মনোযোগ মুসলমানদের কল্যাণার্থে নিবেদিত করেছে। এরা অর্থাৎ মির্যা বশিরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ এবং তাঁর জামাত একদিকে যেখানে মুসলমানদের রাজনীতিতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন সেখানে মু সলমানদের সাংগঠনিক শক্তি, তবলীগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের (উন্নতির) ক্ষেত্রেও নিরলস চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ হল আহ্মদীদের ভূমিকা। মনোযোগ দিয়ে শুনুন কী বলছেন, বলছেন, আর সেই সময়টি দূরে নয় যখন এই সুসংগঠিত ফির্কার কর্মপদ্ধতি সার্বিকভাবে সবমুসলমানের জন্য আর বিশেষভাবে সে সকল ব্যক্তিদের জন্য আলোকবর্তিকা প্রমাণিত হবে যারা বিসমিল্লাহ্র গম্বুজে বসে ইসলামের সেবার বড় বড় অথচ অন্তঃসারশূন্য আস্ফালনে রত।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২২)

অর্থাৎ বড়ো বড়ো মিম্বরে চড়ে ধর্মীয় নেতা সেজে বড়বড় দাবিকরে থাকে, কিন্তু তিনি বলছেন, এগুলো কেবল তাদের অন্তঃসারশূন্য ও হীন দাবি মাত্র, কিন্তু এরা (আহ্মদীরা) তাদের জন্য আলোকবর্তিকা সাব্যস্ত হবে। তোমরা দেখো! এই দিন অবশ্যই একদিন আসবে। এ হল ন্যায়পরায়ণ আলেমদের অভিমত। বর্তমান যুগের নামসর্বস্ব আলেম যারা আহ্মদীদেরকে পাকিস্তান ও ইসলামের শত্রু বলে অভিহিত করে থাকে তাদের উচিত এই আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখা যে, ইসলামের জন্য হৃদয়ে বেদনা কি আহ্মদীরা লালন করে নাকি এসব নামধারী আলেমরা।

সৈয়দ হাবীব সাহেব নামক এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ১৮৯১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। উর্দূ ভাষার একজন প্রসিদ্ধ ও সম্মানীত সাংবাদিক ছিলেন। তিনি 'ফুল অওর তেহযিবে নিসওয়াঁ' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি পত্রিকা 'নুকুশ','সিয়াসাত' এবং 'দৈনিক গাজী' চালু করেন। অত্যন্ত নিভীক এবং সাহসী সাংবাদিক ছিলেন। ১৯৫১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(ইয়ারানে কাহান, প্রণেতা-আব্দুল মজীদ সালিক, পৃ: ১৮৯-২০০)

'অল্ ইন্ডিয়া কাশ্মীর কমিটি'- ১৯৩১ সালের ২৫ জুলাই গঠিত হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন এই কমিটির সভাপতির পদ থেকে

পদত্যাগ করেন, যখন কমিটি গঠিত হয় তখন সব মুসলমানের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সভাপতি নির্বাচিত হন; যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি সময়ে এসে এই কমিটির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তখন সৈয়দ হাবীব সাহেব ১৯৩৩ সনের ১৮ মে তারিখে প্রকাশিত তার পত্রিকা 'সিয়াসাত লাহোর'-এ লিখেন, আমার জ্ঞানমতে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ডা. আল্লামা ইকবাল সাহেব এবং মালেক বরকত আলী সাহেব-উভয়েই সম্মিলিতভাবেও এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। এভাবে এটি মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে, যে যুগে কাশ্মীরের অবস্থা সঙ্গীন ছিল সে যুগে যারা ভিন্ন মতাদর্শী হওয়া সত্ত্বেও মির্যা সাহেবকে সভাপতি নির্বাচিত করেছিলেন, তারা কাজের সফলতাকে দৃষ্টিতে রেখে সর্বোত্তম নির্বাচন করেছিলেন। সে সময় যদি ভিন্ন মতাদর্শী হওয়ার কারণে মির্যা সাহেবকে নির্বাচন করা না হতো তাহলে এই আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে মুখ থুবড়ে পড়তো এবং এই মুসলিম জাতি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতো।

আমার দৃষ্টিতে মির্যা সাহেবের পৃথক হয়ে যাওয়া প্রকারান্তরে কমিটির মৃত্যুর নামান্তর। সার কথা হলো, আমাদের নির্বাচন কতটা সঠিক তা এখন পৃথিবীর স্পষ্ট হয়ে যাবে।"

(মাসিক খালিদ পত্রিকা, মুসলেহ মওউদ নম্বর, জুন-জুলাই-২০০৮, পৃ: ৩২৩)

এখন বোঝা যাবে যে মির্যা সাহেব কী কাজ করেছিলেন আর ডাক্তার আল্লামা সাহেব কী কাজ করেন এবং তাদের কমিটি তাঁর (মির্যা সাহেবের) অনুপস্থিতিতে কী কাজ করে। পরবর্তীতে কী হয়েছিল জগত তা দেখেছে। সব কিছুইচোখের সামনে রয়েছে। তিনি এ কাজ কেন করেছেন? এর কারণ হলো বন্দিদের পরিত্রাণের কারণ তার হবার ছিল। তিনি নেতৃত্ব তো ছেড়ে দিয়েছিলেন আর পরবর্তীতেও কমিটি অনেক কাজ করেছে, কিন্তু সে সহমর্মিতার কারণেআড়ালে থেকেও সাধ্যানু যায়ী যতটুকু সাহায্য করতে পারতেন তা করেছেন, আর ইতিহাস এর স্বাক্ষী।

অতঃপর রয়েছেন মওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী সাহেব। তিনি ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতবর্ষের উর্দু সাহিত্যের একজন লেখক, কলামিষ্ট, গবেষক এবং কুরআনের মুফাস্সিরও ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানীর (রা.) এর প্রয়াণে মওলানা আব্দুল মাজেদ সাহেব ১৮ নভেম্বর, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত তাঁর পত্রিকা 'সিদকে জাদীদ' -এ লিখেন, তাঁর অন্যান্য বিশ্বাস যেমনই হোক না কেন, কুরআন ও কুরআনের জ্ঞানভান্ডারের বিশ্বব্যাপী প্রসার ও এর সার্বজনীন প্রচারের নিমিত্তে তিনি যে গভীর কর্মতৎপরতা ও দৃঢ়তার সাথে সারাজীবন চেষ্টাপ্রচেষ্ঠা অব্যাহত রেখেছেন, এর পুরস্কার আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রদান করুন। তিনি স্বয়ং কুরআনের তফসীরকারক অথচ তিনি নিজে মুসলেহ্ মওউদ সম্পর্কে এ কথা বর্ণনা করছেন। আর তার এসব সেবামূলক কাজের জন্য তার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন। এরপর লিখেন, জ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে যদি দেখি বলতে হয় কুরআনে বিধৃত গূঢ় সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানভাণ্ডরকে বোধগম্য করতে গিয়ে যে অনুবাদ ও সাবলিল তফসীর তিনি করে গেছেন তারও এক সুউচ্চ ও অনন্য পদমর্যাদা রয়েছে।

(মাসিক আনসারুল্লাহ্, মুসলেহ মওউদ নম্বর-মে-জুন, ২০০৯, পৃ: ৮৭৯)

মুসলমানদের মাঝে একজন তফসিরকারক স্বয়ং এটি স্বীকার করছেন।বিশ্বাসের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও যাতে তিনি নিজেকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে জ্ঞান করে থাকবেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদের (রা.) কুরআন ও ইসলাম সেবার প্রশংসা না করে পারেননি।

বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা তার সম্পর্কে দিয়েছিলেন, তাই অন্য কারে পক্ষে তাঁর যুগে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার (কথা) বলা সম্ভব ছিল না ? বরং পরবর্তীতে আগমনকারীরাও তাঁর জ্ঞানকে কাজে লাগালেই কেবল সঠিক পথে ধাবমান হতে পারবে।

এরপর রয়েছেন ড. আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল সাহেব। তার বরাতে জামাতের বিরুদ্ধে অনেক উচ্চবাচ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু তার এ সকল কথাও সংরক্ষিত রয়েছে। ২৪ মার্চ, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে একটি জলসা হয় যার সভাপতিত্ব করেছেন আল্লামা ইকবাল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সেখানে বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্য শেষে আল্লামা সাহেব বলেন, দীর্ঘদিন পর লাহোরে এমন তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য শোনার সুযোগ হয়েছে। বিশেষত, মির্যা সাহেব কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ থেকে যেসব দলিল গ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত চমৎকার। আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করতে পারছি না পাছে এই বক্তৃতার অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদের বক্তৃতার যে স্বাদ আমি অনুভব করছি তা উবে না যায়।"

(আল ফজল, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯, পৃ: ৬)

ইতিহাসের অধ্যাপক সৈয়দ আব্দুল কাদের সাহেব এম.এ লাহোরের ইসলামীয়া কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লাহোরে 'ইসলাম মেঁ ইখতিলাফাত কা আগায' বা "ইসলামে মতবিরোধের সূচনা" এ বিষয়ে একটি বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ছিল। ইনি সভাপতিত্ব করছিলেন। সভাপতির ভাষণে সৈয়দ আব্দুল কাদির সাহেব বলেন, "জ্ঞানী পিতার জ্ঞানী পুত্র হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন নামটিই একথার যথেষ্ট প্রমাণ যে, এই বক্তব্য অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। আমি নিজেও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি জানি। আমি দাবির সাথে বলতে পারি যে, মুসলিম ও অমুসলিম খুব কম ইতিহাসবিদ আছেন যারা হযরত উসমান (রা.) -র খিলাফতকালীন মতবিরোধের গভীরে অবগাহন করতে পেরেছেন এবং সেই ধ্বংসাত্মক প্রথম গৃহযুদ্ধের কারণ বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। হযরত মির্যা সাহেব কেবল গৃহযুদ্ধের কারণই বুঝতে সক্ষম হন নি বরং তিনি ঘটনাগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করেছেন যেগুলোর কারণে মুসলিম খিলাফত দীর্ঘকাল অনিশ্চয়তার দোলাচালে দুলছিল। আমার মনে হয়, ইসলামের ইতিহাস অনুরাগী বন্ধুদের দৃষ্টিতে এমন যুক্তিপূর্ণ নিবন্ধ পড়ে নি।" (আল ফজল, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০২, পৃ: ১৩)

ভারত সংক্রান্ত ব্রিটিশ মন্ত্রী এডউইন স্যামুয়েল মন্টাগু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় বিষয়াদির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্রেটারি অফ স্টেট ছিলেন। তিনি সেই সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতসংক্রান্ত বিষয় দেখাশুনার জন্য সেক্রেটারি অফ স্টেট ছিলেন যখন ইন্দোপাক বা উপমহাদেশ ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ছিল। ১৯১৭-১৯১৮তে তিনি এই পদে দায়িত্বরত ছিলেন। সেই দিনগুলোতে তিনি ভারতের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ভারত সফরে যান। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তার নিকট অর্থাৎ ভারতসংক্রান্ত মন্ত্রীর নিকট একটি ভাষণ আকারে ভারতের বিষয়গুলি সমাধানের জন্য একটি সুস্পষ্ট ও বিশদ নির্দেশিকা প্রেরণ করেছিলেন। এই ভাষণ টি তার নিকট লাহোরে উপস্থাপন করা হয় যেটি হযরত স্যার জাফরুল্লাহ খান সাহেব পাঠ করে শোনান। হুযূর (রা.) নিজেও মন্ত্রী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। মন্টাগু সাহেব এই ভাষণটি বিস্তারিতভাবে নিজ ডায়েরিতে নোট করেন যা তার মৃত্যুর পর An Indian Diary নামে প্রকাশিত হয়। তিনি ১৫ নভেম্বর ১৯১৭ তারিখের পাতায় লিখেন: চতুর্থ প্রতিনিধিদল ছিল আহমদীদের যারা মুসলমানদেরই একটি সম্প্রদায়। তারা মুসলমান আর তারা মানবতার ঐক্যে বিশ্বাসী এবং সকল নবীর প্রতি বিশ্বাস রাখে। তারা একটি বিস্তারিত পাণ্ডলিপি পাঠ করে শোনান যা তাদের হুযূর লিখেছেন। আমার সামনে উপস্থাপিত সকল পাণ্ডলিপির চেয়ে এটি বেশি উন্নত মানের ছিল। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল প্রতিনিধি দলের প্রস্তাবগুলির চেয়ে এই পাণ্ডুলিপি ছিল উত্তম যা গভীর চিন্তাভাবনার পর পরম বুদ্ধি খাটিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে।

তার শেষ কথার মূল শব্দগুলো হলো: He has a good mind and had carefully thoughtout his constitutional scheme.অর্থাৎ, তাঁর মেধা অত্যন্ত প্রখর এবং খুবই সাবধানতার সাথে গভীর চিন্তাভাবনার পর আমাদেরকে একটি আইনী স্কীম প্রদান করেছেন।

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮-২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২০, পৃ: ৫৪, মুসলেহ মওউদ দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রকাশনা)

ইনি একজন শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ যিনি এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে একথা বলছেন যার কোন জাগতিক শিক্ষাদীক্ষা ছিল না । এটি কেন হবে না, ভবিষ্যদ্বাণীতে যে রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে জাগতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করবেন।

হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট চৌধুরী মুহাম্মদ আকবর খাঁন ভাট্টি সাহেব বলেন: একটি ঘটনার উল্লেখ করা অযথা হবে না। সাপ্তাহিক 'পারেস' পত্রিকার সম্পাদক লালা করম চান্দ একবার কয়েকজন সাংবাদিকদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে কাদিয়ানের সালানা জলসায় অংশগ্রহন করেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর তারা তাদের পত্রিকায় একের পর এক প্রবন্ধে এমনভাবে মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের নেতৃত্বের বিচক্ষণতা ও ব্যক্তিত্বের উল্লেখ এমনভাবে করেন যে সেগুলোর কারনে বিরোধীদের মাঝে হৈ চৈ পড়ে যায়। তিনি আমাকে বললেন যে আমরা তো জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেবকে অনেক বড় ব্যক্তি মনে করতাম (জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব সেসময় ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন) কিন্তু মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদের সামনে তার অবস্থা মক্তবের শিশুর মত। তিনি সকল বিষয়ে তার চেয়ে ভালো মতামত রাখেন অর্থাৎ মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সকল বিষয়ে জাফরুল্লাহ খান সাহেবের চেয়ে উত্তম জ্ঞান রাখেন এবং উত্তম দলিল উপস্থাপন করেন। তাঁর মধ্যে অসাধারণ সংগঠনিক দক্ষতা রয়েছে আর এমন ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রকে খুব সহজেই উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারে। দেশ বিভাগের পর মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব একবার লণ্ড কলেজে 'দেশের উন্নতির সম্ভাবনা' বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতাসমূহে তিনি

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞ প্রভাষকের মত ব্ল্যাকবোর্ড ও গ্রাফের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণাত্মক চিত্র তুলে ধরেন। লেখক বলছেন যে একটি কথা আমার মনে আছে আর সেটি হলো তিনি বলেছেন পরিতাপের বিষয় হলো 'দেশ বিভাগের পূর্বে হিন্দুস্থানের উপকূলীয় দ্বীপসমূহ যেমন লাক্ষাদ্বীপ, স্বর্ণদ্বীপ, বালাদ্বীপ ইত্যাদির প্রতি মনোযোগ দেয়া হয় নি। এই উপকূলীয় দ্বীপসমূহের অধিকাংশ জনবসতি হলো মুসলমান আর প্রতিরক্ষার দিক থেকে সেগুলোর গুরুত্ব অনেক বেশী। এই বক্তৃতা শুনে শ্রোতামণ্ডলীর মোটের ওপর এই অভিব্যক্তি ছিল যে দেশভাগের কার্যক্রমে যদি খলীফা সাহেবেরও অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হতো। অযথা বিদ্বেষ ও আত্মপ্রবঞ্চণায় লিপ্ত হয়ে জাতীয় পর্যায়ে মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদের আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ হাতছাড়া করা হয়েছে। একজন জজ ব্যক্তিগত কোন বৈঠকে এ কথা স্বীকার করেছেন যে তার সমূহ শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও এই অসাধারণ বিষয়াদি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কোন ধারণা ছিল না। মির্যা মাহমুদ আহমদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনে তার জ্ঞানের সকল প্রকোষ্ঠ আলোকিত হয়ে উঠেছে এবং প্রথমবারের মতো ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তিনি প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করেছেন।"

(আল ফজল ইন্টার ন্যাশনাল, ১৬-২২ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৮, পৃ: ৩)

সুতরাং হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)ই সেই ব্যক্তিত্ব যিনি পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে ও পরে পাকিস্তানের পক্ষে অনেক উচ্চাঙ্গের মতামত প্রদান করেছেন আর শিক্ষিত শেণীর মনমস্তিস্ককে তিনি আলোকিত করেছেন। তারা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)'র কথা শুনে এমনভাবে বিমোহিত হয়ে গিয়েছিল যে তারা তাঁর সামনে নিজেদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র জ্ঞান করছিল আর সেসব বিষয় সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) যখন দামেস্ক সফর করেন তখন দামেস্কের একটি পত্রিকা 'আখবারুল ইমরান' ১০ আগষ্ট ১৯২৪ তারিখের সংখ্যায় 'দামেস্কে মাহ্দী' নামক প্রবন্ধে লিখেছে যে, যখন রাজধানীতে তাঁর আগমণের সংবাদ প্রকাশিত হয় তখন দামেস্কের অনেক জ্ঞানী গুনী ব্যক্তিত্ব তাঁর সাথে কথা বলার জন্য এবং তাঁর জামাতের শিক্ষা সম্পর্কে মুনাযেরা ও মুবাহেসা করার জন্য তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। প্রত্রিকার প্র বন্ধকার লিখেন, তারা তাঁকে অনেক বড় গবেষক, আলেম সব ধর্মের ইতিহাস ও দর্শনের গভীর ব্যুৎপত্তির অধিকারী এবং ঐশী শরিয়তের প্রজ্ঞা ও দর্শনে আলোকিত একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখতে পান।" (আল ফজল, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২, পৃ: ১০) এটি একটি আরবী পত্রিকার সাক্ষ্য।

এরপর ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে পরিকল্পনা করা হচ্ছিল এবং ইসরাইল গঠিত হলে কি হবে- এ বিষয়ে তিনি (রা.) ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত করে সতর্ক করার চেষ্টা করেছেন। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়ে যাওয়ার পরও তিনি এই কাজ অব্যাহত রাখেন। এই বিষয়ে তিনি 'আলকুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা' (সকল কাফেররা মূলত একটি দল) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এটিকে আরব দেশ ও আরবদের কাছে অনুবাদ করে পৌঁছানোর ব্যাবস্থা করা হয় আর আরবদের ও মুসলিম বিশ্বকে সেখানে সতর্ক করে লিখেন এখনও সময় আছে, সতর্ক হয়ে যাও। এই প্রবন্ধের বিষয়ে বেশ কটি আরব পত্রিকাও উল্লেখ করে প্রচার করে আর প্রশংসা করে।

তিনি (রা.) সেটিতে নিজের সংশয় ব্যক্ত করেন, কী আশংকা রয়েছে সেটি উল্লেখ করেন এবং যেই যেই পরিণতি হতে পারে বলে উল্লেখ করেছিলেন আজ ঠিক ওই সকল পরিণতিই আমরা যু দ্ধের মাঝে প্রত্যক্ষ করছি। হায় পরিতাপ! মুসলমানরা যদি সেই সময় গুরুত্ব দিত! আজও যদি তারা কথা শুনে ও মানে তাহলে পরিস্থিত ভিন্ন মোড় নিতে পারে!

এই প্রসঙ্গে বাগদাদের আশ শুরা নামক একটি পত্রিকা ১৮ই জুন ১৯৪৮ সনের সংখ্যায় বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। একইভাবে দামেস্ক থেকে প্রকাশিত আখবার আলআম্বাও এই প্রবন্ধটির জন্য সাধুবাদ জানায় । এটি এমন একটি প্রবন্ধ যেটি আহমদীদেরও পড়া উচিত। এতে অনেক বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। (তারিখে আহমদীয়াত, খণ্ড-১২, পৃ: ৩৯১-৩৯৩)

সর্দার শওকত হায়াত খান সাহেব ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি নিজের গ্রন্থ 'গুমগাশতা কওম' The Nation That Lost Its Soul (যেই জাতি নিজের নৈতিকতা হারিয়ে বসেছেঅনুবাদক)-এর মাঝে লিখেছেন, একদিন আমার নিকট কায়েদে আযমের নিকট থেকে এমর্মে একটি বার্তা পাঠানো হয় যে 'শওকত, আমি শুনলাম তুমি বাটালা যাচ্ছ যা কাদিয়ান থেকে ৫ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। তুমি সেখানে (অর্থাৎ কাদিয়ানে-অনুবাদক) গিয়ে হযরত সাহেবের নিকট আমার আবেদন পৌঁছাও-যেন তিনি পাকিস্তান অর্জনের জন্য নিজের আন্তরিক দোয়া এবং সহযোগিতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমি জলসা সম্পন্ন হওয়ার পর মধ্যরাতের কাছাকাছি রাত ১২টার দিকে কাদিয়ানে পৌঁছাই। হযরত সাহেব বিশ্রাম করছিলেন। আমি তার কাছে কায়েদে আযমের পক্ষ থেকে বার্তা নিয়ে এসেছি মর্মে সংবাদ প্রেরণ করলাম। তিনি তাৎক্ষনাৎ নিচে নেমে এসে এবং জানতে চাইলেন কায়েদে আযম কী বার্তা পাঠিয়েছেন। আমি বললাম তিনি আপনার দোয়া ও সহযোগিতা চেয়েছেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) উত্তরে বলেন, তিনি শুরু থেকেই তার মিশনের সাফল্যের জন্য দোয়া করে আসছেন আর তার অনুসারিদের অর্থাৎ আহমদীদের যতটুকু সম্পর্ক আছে, কোন আহমদী মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দাড়াবে না। আর যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে সে জামা'তের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবে অর্থাৎ কেউ যদি দাড়িয়েও পড়ে, আহমদী হলেও জামা'ত তাকে সঙ্গ দিবে না। মুসলিম লীগের মনোনিত প্রার্থিকে আমরা যে কোন মূল্যে সমর্থন করবো। এই সাক্ষাতের পরিপ্রেক্ষিতে মমতাজ দওলতানা সাহেব শিয়ালকোটের হালকায় একজন আহমদী নওয়াব মোহম্মাদ দীন সাহেবেকে বেশ বড় ভোটের ব্যাবধানে পরাজিত করেন। শওকত হায়াত সাহেব লিখেন, কাদিয়ানিরা তাদের আমীরের আদেশ মান্য করে মুহাম্মদ দীনের পরিবর্তে মমতাজকে ভোট দিয়েছিল। এই মমতাজ দওলতানা সে যে তার শাসনামলে ১৯৫৩ সানে আহমদীদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনা করে। আহমদীরা যতই সাহায্য-সহযোগিতা করুক না কেন এরা হুল ফোটানে থেকে বিরত হয় না। শওকত হায়াত সাহেব আরও লিখেন, যখন আমি পাঠানকোট পৌঁছাই তখন কায়েদে আযম সাহেব আমাকে মাওলানা মৌদুদি সাহেবের সাথেও সাক্ষাত করার আদেশ প্রদান করেন। তিনি চৌধুরী নিয়াযের গ্রাম সন্নিবেশিত বাগানে বিশ্রাম করছিলেন। যখন আমি তার কাছে কায়েদে আযমের বার্তা পৌঁছালাম যে তিনি যেন পাকিস্তানের জন্য দোয়া করেন ও সব দিক দিয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করেন, তখন তিনি উত্তরে বললেন তিনি কিভাবে 'নাপাকিস্তান' অর্থাৎ অপবিত্র স্থানের জন্য দোয়া করতে পারেন। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তার কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যতক্ষণ সমস্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেকে ব্যক্তি মুসলমান না হচ্ছে।

(গুমগাশতা কউম, প্রণেতা-শওকত হায়াত, জঙ্গ পাবলিশার, পৃ: ১৯৫)

তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আজও পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার কথা নয়। জামা'তে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতার এই ছিল দৃষ্টিভঙ্গি। সর্দার শওকত হায়াত সাহেব লিখেন যে, জামা'তে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতার এই ছিল অন্তর্দৃষ্টি এবং দৃষ্টিভঙ্গি আর অপর দিকে দেখ! মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের কী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। আজ ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ এ সকল নামসর্বস্ব আলেমদের দৃষ্টিতে আহমদীরা দেশের শত্রু (অথচ এই আহমদীরাই) যারা দেশের জন্য সব ধরনের ত্যাগস্বীকার করতে (পাকিস্তান)-এর সৃষ্টির সময়ও প্রস্তুত ছিল আর আজও প্রস্তুত আছে। অপরদিকে যারা এই দেশ সৃষ্টির বিরুদ্ধে ছিল তারা আজ দেশের ঠিকাদার বনে বসে আছে। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুতই এ সকল জালেমের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করুন।

এছাড়া মুসলমানদের প্রতি সমবেদনার প্রেরণায় তাঁর আরেক (অনন্য) কৃতিত্ব রয়েছে। ১৯২৩ সালে ঐতিহাসিক শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদের সূচনা করেন। অর্থাৎ হিন্দু বানানোর সেই আন্দোলন যা শ্রদ্ধানন্দ নামের এক হিন্দু নেতা ভারতবর্ষে ঐ সকল মুসলমানদেরকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য আরম্ভ করেছিল যাদের পিতৃপুরুষ কোনো এক সময় হিন্দু ছিল। তিনি একের পর এক অবৈতনিক মোবাল্লেগদের প্রতিনিধি দল মালকানার বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন।

এ বিষয়ে 'মাশরেক গোরাখপুর' পত্রিকা ১৯২৩ সালের ২৯ মার্চ -এর সংখ্যায় লেখে যে, জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম এবং নেতার ধারাবাহিক বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ তার অনুসারীদের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে আর এই জেহাদে এ মুহূর্তে সর্বাগ্রে এই ফির্কাটিই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। যদিও আহমদী ফির্কার দৃষ্টিতে ঐ সকল নওমুসলিমদের দলটিকে সাহায্য করার কোনো প্রয়োজন ছিল না কেননা সেই দলটির সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না কিন্তু যেহেতু নামে মাত্র হলেও তারা মুসলমান ছিল এই আত্মাভিমানে অর্থাৎ ইসলামের নামের জন্য আত্মাভিমানে আহমদীয়া জামা'তের ইমামের মাঝে এই উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর কতিপয় বক্তৃতা দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, এখনো খোদার নামে জীবন উৎসর্গকারী মানুষ আছে! আমাদের ওলামাদের যদি এই বিষয়টির আশংকা থাকে যে, জামা'তে আহমদীয়া নিজেদের আকীদা প্রচার করবে তাহলে তারা ঐক্যবদ্ধ জামা'ত গঠন করে এমন নিষ্ঠা নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেখাক। [যদি অন্যান্য মুসলমানদের এই এই আশংকা থাকে যে, জামা'তে আহমদীয়া পাছে নিজেদের আকীদার প্রসার ঘটায় সেক্ষেত্রে সমস্ত মুসলিম ফির্কার উচিত এক হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। কীভাবে তা করা উচিত? যেভাবে আহমদীরা করে থাকে (সেভাবে করবে)। ছাতু খাবে আর ছোলা চিবাবে এবং ইসলামকে রক্ষা করবে। (আহমদী) যারা সেখানে গিয়েছিল তারা এভাবে দিনাতিপাত করতেন অর্থাৎ রান্না করা খাবার পাওয়া যেত না। তারা ছোলা খেতো আর ছাতু পান করতো।তিনি বলেন, জামা'তে আহমদীয়ার সদস্যদের মাঝে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 28 March, 2024 Issue No.13

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নিষ্ঠা দেখে আসছি। সততা, অঙ্গীকার পালন, নিজেদের ইমামের আনুগত্য- এগুলো হলো এ জামা'তের সদস্যদের বৈশিষ্ট্য। মির্যা সাহেব এবং তাঁর জামা'তের সুমহান উদ্দীপনা এবং আত্মত্যাগের প্রশংসা করে মুসলমানদের মাঝে এমন ত্যাগ স্বীকারের চেতনাবোধ জাগ্রত করেছেন তিনি। তিনি বলছেন এরা(আহমদীরা) ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে এটি বলে অন্যান্য মুসলমানের মাঝে এমন ত্যাগ স্বীকারের আত্মাভিমান জাগ্রত করছেন । তোমরাও ঐক্যবদ্ধ হও এবং এভাবে নিজেদের মাঝে আত্মত্যাগের চেতনা সৃষ্টি করো। সততা এবং বিশ্বস্ততা- যেটি মুসলমানদের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল তা আজ এদের (তথা আহমদীদের) মাঝে পরিদৃষ্ট হয়। জামা'তে আহমদীয়ার বদান্যতা এবং আত্মত্যাগের পাশাপাশি তাদের সততা আর আয়-ব্যয়ের নিখুঁত হিসাব এবং নিয়মতান্ত্রিকতা সবচেয়ে বেশি প্রশংসনীয় আর এ কারণেই আয় স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও এরা বড় বড় কাজ করছে।"

(মসীহ মওউদ অউর জামাত আহমদীয়া ইনসাফ পসন্দ আসহাব কি নযর মেঁ, সংকলক: আব্দুল মান্নান শাহিদ, পৃ: ২৬১-২৬২)

[একথা অন্যরা স্বীকার করছে।]

তাঁর (রা.) হৃদয়ে এই বেদনা ছিল যার কারণে তিনি (রা.) জামা'তের মাঝে বিশেষ তাহরীক করে পুরো জামা'তকেই কোনো না কোনোভাবে এ কাজে সম্পৃক্ত করেন এবং সক্রিয় করে তুলেন- যা জামা'তের বাইরের লোকও স্বীকার করে।

মীম শীন সাহেব একজন বিখ্যাত সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন। তার ছদ্মনাম ছিল মীম শীন আর ভাল নাম ছিল মিয়া মুহাম্মদ শাফী। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা)-এর মৃত্যুতে তিনি 'লাহোর ডায়রী' তে লিখেন- মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ ১৯১৪ সালে খিলাফতের আসনে সমাসীন হবার পর যেভাবে নিজ জামাতকে সুসংগঠিত করেছেন এবং যেভাবে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়াকে একটি কর্মমুখী এবং সচল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন, এর মাধ্যমে তার (রা.) গভীর সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও তার কাছে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল না। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে পড়াশুনা করে নিজেকে সত্যিই আল্লামা আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য করে তুলেছিলেন। তিনি একবার একটি সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন, আমি সিভিল এন্ড মিলিটারি গেজেট নিয়মিত পড়ার মাধ্যমে ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করেছি। তার ভাষ্যমতে যতদিন খাজা নযির আহমদের সময় এই পত্রিকা বন্ধ হয় নি ততদিন তিনি এটি নিয়মিত পাঠ অব্যাহত রেখেছিলেন। মির্যা সাহেব একজন অত্যন্ত বাগ্মী বক্তা এবং দক্ষ প্রবন্ধাকার ছিলেন। জামাতের উন্নতির পথ সুগম করার জন্য সকল সুযোগের নির্দ্বিধায় সদ্ব্যবহার করতেন। জামাতের ক্ষেত্রে তার একটি বড়ো অবদান হলো ভারতবর্ষের ভাগ হওয়ার পর যখন কাদিয়ান তার হস্তচ্যুত হয় তখন তিনি রাবওয়াতে দ্বিতীয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।"

(আল ফজল, ১১ ই ডিসেম্ব, ১৯৬৫, পৃ: ৫)

পুনরায় 'The Light' নামে লাহোরী জামা'তের মুখপত্র হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর মৃত্যুতে (শোকবার্তা) প্রকাশ করে। যার শিরোনাম ছিল- A great Nation builder (অর্থাৎ এক মহান জাতীয় কারিগর।) ১৯৬৫ সালের ১৬ নভেম্বরের সংখ্যায় তারা লেখে, আহমদীয়া জামাতের ইমাম মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ-এর মৃত্যু ঘটনাবহুল এক এমন জীবনের পরিসমাপ্তিতে গিয়ে ঠেকেছে যা সুদূরপ্রসারী ফলাফল বহনকারী অগণিত সুমহান কর্মযজ্ঞ ও কর্মাভিযানে ছিল ভরপূর। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়াদির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণশীল একজন প্রতিভাবান ও সীমাহীন কর্মশক্তিতে বলিয়ান ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। গত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ধর্মীয় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্ব থেকে শুরু করে তবলীগ ও ইসলামের প্রচারের ব্যবস্থা পর্যন্ত অধিকন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব পর্যন্ত চিন্তা ও মননশীলতার এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যাতে মরহুম তার অনন্য প্রতিভার সুগভীর ছাপ রেখে যান নি। পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত ইসলামী মিশনের এক জাল বিছানো, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বহু মসজিদ নির্মান এবং বহুকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টান মিশনের সমূলে উৎপাটনকারী ইসলামের তবলীগের আফ্রিকাতে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার- হলো এমন সব সমুজ্জ্বল কৃতিত্ব যা মরহুমের সৃজনশীল পরিকল্পনা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের সপক্ষে একটি দৃঢ় ও চিরস্থায়ী স্মারকের মর্যাদা রাখে। বর্তমান যুগে খুব কমই এমন নেতা থাকবে যে তার অনুসারীদের এমন আবেগমাখা ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ লাভের যোগ্য প্রমানিত হয়েছেন। এছাড়া তার অনু সারীদের পক্ষ থেকে হৃদয় নিংড়ানো প্রেম ও আত্মত্যাগের বহিঃপ্রকাশ কেবল তার জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তার প্রয়ানেও একই তীব্রতায় এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল যখন দেশের সকল প্রান্ত থেকে ষাট হাজার মানুষ তাদের বিদায়ী ইমামকে নিজ ভালবাসার অন্তিম উপঢৌকনটুকু নিবেদনের জন্য পাগলের মতো ছুটে এসেছিল। আহমদীয়া জামাতের ইতিহাসে মির্যা সাহেবের নাম এমন এক মহান জাতীয় কারিগর হিসেবে চিরদিন জীবিত থাকবে যিনি ভয়াবহ সমস্যার মুখে একটি ঐক্যবদ্ধ সুসংহত জামাত প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন। আর এটিকে এমন এক শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন যাকে কখনো উপেক্ষা করা যায় না।" (তারিখে আহমদীয়াত, খণ্ড-২৩, পৃ: ১৮২)

বিরোধিতা সত্ত্বেও লাহোরীদের পত্রিকাও এ ধরনের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন যে, তিনি এক মহান নেতা ছিলেন। যাই হোক, এগুলো হলো তাদের উদারতার প্রমাণ।

মুসলেহ মওউদ (রা.) সম্পর্কে অ-আহমদীদের এরকম অনেক মন্তব্য রয়েছে। এছাড়াও তিনি (রা.) বিভিন্ন বিষয়ে জামাতকে এবং সাধারণভাবে সকল মুসলমানকে নসীহত করেছেন এবং পথনির্দেশনা দিয়েছেন। এমন অসংখ্য বড়বড় খণ্ডসম্বলিত প্রবন্ধ ও পুস্তক রয়েছে, কিছু প্রকাশিত হয়েছে আর কিছু প্রকাশ হবার পথে। বক্তৃতাসমূহই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে গেছে। খুতবা প্রকাশিত হয়েছে ছাব্বিশ, সাতাশ বা আঠাশ খণ্ডে। যাহোক, তিনি অনেক উপদেশ দিয়ে গেছেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো কোন স্কুল, মাদরাসা, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন ছাড়াই আল্লাহ্ তা'লা তাকে কুরআনের যে জ্ঞান দিয়েছিলেন তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ সম্পর্কেও (জামাতের বাইরের) অন্যদের অগণিত মন্তব্য রয়েছে যা বিগত বছরগুলোতে আমি উল্লেখ করেছি। পুরনো রেকর্ডসমূহ থেকে অপ্রকাশিত নোট বা খুতবা এবং বক্তৃতাসমূহ থেকে কুরআন করীমের যেসব তফসীর সামনে আসছে তা এখনো ছাপানো হয় নি। তফসীরে কবীরে এগুলো এখনও অন্তর্ভুক্ত হয় নি এবং দশ খন্ডের তফসীরে কবীরের চাইতে এগুলোর পরিমান প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি। ইনশাআল্লাহ্ এগুলোও শীঘ্র প্রকাশিত হবে। এ সবকিছু ই আল্লাহ্ তা'লা তাকে দান করেছেন, সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করেছেন। হযরত মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত এ ভবিষ্যদ্বানী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ মহান ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি এবং আমাদের ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যম।

ইংরেজী ভাষাতেও অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। যারা উর্দূ বোঝে না তাদের সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা প্রয়োজন। পূর্বেও আমি এ ব্যাপারে বলেছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে জ্ঞানের এ ভান্ডার থেকে উপকৃত হবার সৌভাগ্য দান করুন।

বর্তমানে পাকিস্তানে পুনরায় জামাতের বিরুদ্ধে বিরোধিতার ঢেউ মাথাচাড়া দিয়েছে। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং মৌলবীরা যারা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে বা যারা মর্জিমাফিক ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের একটি বড় সংখ্যা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুনরায় আহমদীদের ওপর আক্রমন করছে। তারা সর্বদাই এমনটি করে আসচে, যখনই নিজেরা ব্যর্থ হয় তখন সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য আহমদীদের বিরুদ্ধে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। এরা বর্তমানে সেই পায়তারাই করছে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা যা করতে পারে, করছে এবং করবে। এজন্য আহমদীদের যেখানে সতর্ক থাকা প্রয়োজন সেখানে দোয়া ও সদকার উপরও অনেক জোর দিতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদেরকে নিরাপদে রাখুন।

ইয়েমেনের আহমদীদের জন্যও অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্যও স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করুন। তাদের অনেকেই বন্দী জীবন যাপন করছেন। তাদেরকে শীঘ্র বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিন। ফিলিস্তিনীদের জন্যও দোয়া করুন।

আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতিও দয়া করুন এবং পরাশক্তিদের অত্যাচারের যাতাকল থেকে তাদের মুক্তি দিন।ঘানায় জলসা হচ্ছে, গতকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে আর আগামীকাল শনিবার শেষ দিন। তাদের সার্বিক সাফল্যের জন্য দোয়া করুন। এটি তাদের জামাত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি জলসা। আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ জলসায় আমার বক্তৃতা এখান থেকে লাইভ সম্প্রচার হবে। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন।

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir